মাসিক

আল-আবরার

الأبرار

The Monthly AL-ABRAR

مجلة شهرية دعوية فكرية ثقافية اسلامية

রেজি. নং-১৪৫ বর্ষ-৭, সংখ্যা-০৩

এপ্রিল ২০১৮ ইং, রজব-শা'বান ১৪৩৯ হি., চৈত্র ১৪২৪ বাং

رجب و شعبان ١٤٣٩ه، ابريل ٢٠١٨م

প্রতিষ্ঠাতা

ফকীহুল মিল্লাত মুফতী আবদুর রহমান (রহমাতুল্লাহি আলাইহি)

প্রধান সম্পাদক

মুফতী আরশাদ রহমানী

সম্পাদক

মুফতী কিফায়াতুল্লাহ শফিক

নির্বাহী সম্পাদক

মাওলানা রিজওয়ান রফীক জমীরাবাদী

সহকারী সম্পাদক

মাওলানা মুহাম্মদ আনোয়ার হোসাইন

বিজ্ঞাপন প্রতিনিধি

মুহাম্মদ হাশেম

সম্পাদনা বিষয়ক উপদেষ্টা

মুফতী এনামুল হক কাসেমী
মুফতী মুহাম্মদ সুহাইল
মুফতী আব্দুস সালাম
মাওলানা হারুন
মুফতী রফীকুল ইসলাম আল-মাদানী

সার্কুলেশন বিষয়ে যোগাযোগ

০১৯৭৮৪২৪৬৪৭

বিনিময় : ২০ (বিশ) টাকা মাত্র

যোগাযোগ

সম্পাদনা দফতর

মারকাযুল ফিকরিল ইসলামী বাংলাদেশ
ব্লক-ডি, ফকীহুল মিল্লাত সরণি, বসুন্ধরা আ/এ, ঢাকা।
ফোন : ০২-৮৪৩২০৯১, ০২-৮৮৪৫১৩৮
ই-মেইল : monthlyalabrar@gmail.com
ওয়েব : www.monthlyalabrar.wordpress.com
www.facebook.com/মাসিক-আল-আবরার

সূচিপত্র

সম্পাদকীয় ২

পবিত্র কালামুল্লাহ থেকে : ৩

পবিত্র সুন্নাহ থেকে :

'ফাজায়েলে আমাল' নিয়ে এত বিভ্রান্তি কেন-৪০....... ৪

দরসে ফিক্বহ :

ক্রিপ্টো কারেন্সি "বিট কয়েনে" লেনদেনের শরয়ী বিধান

মুফতী শাহেদ রহমানী..................................... ৬

হযরত হারদুয়ী (রহ.)-এর অমূল্য বাণী ১৪

ইফাদাতে ফকীহুল মিল্লাত :

শবে বরাতের ফজীলত ও করণীয়....................... ১৫

"সিরাতে মুস্তাকীম" বা সরলপথ :

উলামায়ে হকের পরিচয়.............................. ১৭

শায়খুল হাদীস আল্লামা মুফতী মনসূরুল হক্ব

শান্তি ও মুক্তি কোন পথে ২১

মাওলানা সায়্যিদ আরশাদ মাদানী দা.বা.

এপ্রিলফুল : ইতিহাসের সত্য-মিথ্যা.....................২৮

মাওলানা শরীফ উসমানী

মুবাল্লিগ ভাইদের প্রতি হযরতজির হেদায়াত-৪........৩৩

মুফতী শরীফুল আজম

ভিন্ন চোখে কওমী মাদরাসা-১৬ .... ৩৯

মাওলানা কাসেম শরীফ

জিজ্ঞাসা ও শরয়ী সমাধান ৪৩

মোবাইল: প্রধান সম্পাদক: ০১৮১৯৪৬৯৬৬৭, সম্পাদক:০১৮১৭০০৯৩৮৩, নির্বাহী সম্পাদক:০১৮৩৮৪২৪৬৪৭ সহকারী সম্পাদক: ০১৮৫৫৩৪৩৪৯৯
বিজ্ঞাপন প্রতিনিধি: ০১৭১১৮০৩৪০৯, সার্কুলেশন ম্যানেজার : ০১৯৭৮৪২৪৬৪৭

সম্পাদকীয়

পবিত্র কোরআনের অনুবাদে ভুল-ত্রুটি পরিমার্জন : পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন

সম্প্রতি ইসলামিক ফাউন্ডেশনের মহাপরিচালক বলেছেন, বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রকাশনা সংস্থা থেকে মুদ্রিত পবিত্র কোরআনুল কারীমে ইবারত ও অনুবাদে ভুল-ত্রুটি যাচাই করা হচ্ছে। যদি ভুল-ত্রুটি থাকে তা চিহ্নিত করে বাংলাদেশের হক্কানী আলেম-উলামার সামনে উপস্থাপন এবং তাঁদের সম্মিলিত সিদ্ধান্তের মাধ্যমে সেসব ভুল-ত্রুটি পরিমার্জন করা হবে।

এক মতবিনিময় সভায় তিনি বলেন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, বাজারে প্রচলিত বিভিন্ন প্রকাশনা সংস্থার প্রকাশিত পবিত্র কোরআনের অনুবাদে কিছু ভুল রয়েছে। এসব ভুল সংশোধনের জন্য প্রধানমন্ত্রী নির্দেশ দিয়েছেন।

ইফা মহাপরিচালক বলেন, বাজার থেকে আমরা প্রায় ৭০ কপি কোরআন শরীফ সংগ্রহ করেছি। এর মধ্যে ইচ্ছাকৃত কিংবা অনিচ্ছাকৃত ভুল রয়েছে। মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রহ.) কর্তৃক অনূদিত কোরআন শরীফ প্রায় ২৫টি প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান ছাপিয়েছে। মূল থেকে বাংলায় অনুবাদ করতে গিয়ে কিছু ভুল হতে পারে। (জাতীয় দৈনিক ২৬-০৩-২০১৮)

পবিত্র কোরআনের সঠিক অনুবাদ সংরক্ষণের ক্ষেত্রে সরকারের এই উদ্যোগ একটি উত্তম, স্মরণীয় এবং কল্যাণকর উদ্যোগ। হক্কানী উলামায়ে কেরামের সঠিক ও নিবিড় তত্ত্বাবধান, কার্যকর দিকনির্দেশনা, সরকারের আন্তরিক প্রচেষ্টা এবং খুলুসিয়্যাতপূর্ণ কর্মযজ্ঞ কাজটিকে অবিস্মরণীয় অবদানে রূপান্তর করতে পারে বলে আমরা মনে করি। কিন্তু এই কাজের মহানতা এবং গুরুত্ব বিবেচনায় যদি সতর্ক উদ্যোগ নেওয়া না যায় তবে হিতে বিপরীত হওয়ারও সমূহ সম্ভাবনা।

মুসলমানদের কিছু শ্রেণীর কাছে নিজেদের চিন্তাধারা ও মতবাদ সাপেক্ষ পবিত্র কোরআন-হাদীসের অনুবাদ-ব্যাখ্যা ও তাফসীর প্রদান করার প্রবণতা অনেক আগে থেকেই ছিল এবং আছে। যার কারণে সলফে সালেহীনগণ উলূমুল কোরআন নামে একটি স্বতন্ত্র শাস্ত্র প্রণয়ন করেন। যার পরিধি অনেক বিস্তৃত এবং সুদীর্ঘ। হাদীসের সঠিক সংরক্ষণে যেমন উলূমুল হাদীসের অবদান অবিস্মরণীয়, তেমনি পবিত্র কোরআনের সঠিক তরজমা ও তাফসীর সংরক্ষণ এবং অটুট রাখার ক্ষেত্রে উলূমুল কোরআনের অবদানও অকল্পনীয়। এর মাধ্যমে যুগ যুগ ধরে উলামায়ে কেরাম পবিত্র কোরআনের ভুল অনুবাদ এবং ব্যাখ্যাগুলো চিহ্নিত করেছেন। যখনই কোনো বাতিল ফেরকা নিজেদের স্বার্থে পবিত্র কোরআনের অপব্যাখ্যা করতে চেষ্টা করেছে উলামায়ে কেরাম তা চিহ্নিত করে মুসলিম উম্মাহকে সতর্ক করেছেন। এই ধারাবাহিকতাও অনেক আগে থেকেই চলে আসছে।

এ বিষয়ে দারুল উলূম দেওবন্দের ভূমিকা ও অবদান একক ও অনন্য। যখন যেকোনো মহল থেকে পবিত্র কোরআনের অপব্যাখ্যা এসেছে, দারুল উলূম দেওবন্দের সন্তানগণ তা রুখে দিয়েছে। দারুল উলূম দেওবন্দ কোরআনের এই সংরক্ষণকার্য পরিচালনার জন্য উলূমুল কোরআনে উচ্চতর গবেষণার ব্যবস্থা করেছে। বাংলাদেশে বড় বড় জামিয়াগুলোতে 'তাফসীর বিভাগ' নামে উলূমুল কোরআনে উচ্চতর গবেষণা বিভাগ রয়েছে। সেখানে পবিত্র কোরআনের সঠিক তরজমা ও তাফসীরের ওপর নিবিড় গবেষণা করা হয়। সাথে সাথে প্রাচীন ও আধুনিক বিভিন্ন ফেরকার কোরআনের অপব্যাখ্যা ও ভুল অনুবাদ যাচাই-বাছাই করা হয়। এই কারণেই উলামায়ে দেওবন্দ যুগ যুগ ধরে বিভিন্ন ফেরকার কোরআনিক অপব্যাখ্যা ও ভুল তরজমাগুলো চিহ্নিত করে মুসলমানদের সে ব্যাপারে সতর্ক করার মতো মহান অবদান রাখতে সক্ষম হয়েছে।

বলার অপেক্ষা রাখে না যে বহু প্রকাশনীর পবিত্র কোরআনের তরজমা ও তাফসীরে বিভিন্ন ভুল রয়েছে। কিন্তু এ বিষয়েও কোনো সন্দেহ নেই যে বিভিন্ন ফেরকার নামে প্রকাশিত কোরআনে কারীমের ইবারত, তরজমা, তাফসীরসহ সর্ব বিষয়ে ইচ্ছাকৃত ও অনিচ্ছাকৃত অসংখ্য ভুল-ত্রুটি বিদ্যমান। এসব ভুলভ্রান্তি মুসলিম উম্মাহের বিশাল একটি অংশকে বিপথগামী এবং অগণিত গোনাহের সম্মুখীন করছে। ইসলামের নামে সৃষ্টি হচ্ছে বিভিন্ন বাতিল চিন্তাধারা। হেদায়াতের পরিবর্তে প্রচলিত হচ্ছে অসংখ্য গোমরাহী ও শরীয়তবিরোধী মতবাদ।

সরকার যদি একটি উন্নত মাপকাঠির অনুকরণে, দেশের শীর্ষ উলামায়ে কেরামের ঐক্যবদ্ধ সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে, বিশেষ করে দেশের বড় বড় মাদরাসা কর্তৃক পরিচালিত উচ্চতর তাফসীর গবেষণা বিভাগগুলোর নিবিড় তত্ত্বাবধানে এই মহান কাজটি সুসম্পন্ন করতে চায় ইনশাআল্লাহ সফল হওয়া যাবে।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন সকলের সহায় হোন। আমীন।

আরশাদ রহমানী
ঢাকা
২৭/০৩/২০১৮ইং

পবিত্র কালামুল্লাহ শরীফ থেকে

উচ্চতর তাফসীর গবেষণা বিভাগ :
মারকাযুল ফিকরিল ইসলামী বাংলাদেশ

بسم الله الرحمن الرحيم

وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا

আর যখন তাদের কাছে পৌঁছে কোনো সংবাদ শান্তিসংক্রান্ত কিংবা ভয়ের, তখন তারা সেগুলোকে রটিয়ে দেয়। আর যদি সেগুলো পৌঁছে দিত রাসূল পর্যন্ত কিংবা তাদের শাসকদের পর্যন্ত, তখন অনুসন্ধান করে দেখা যেত সেসব বিষয়, যা তাতে রয়েছে অনুসন্ধান করার মতো। বস্তুত আল্লাহর অনুগ্রহ ও করুণা যদি তোমাদের ওপর বিদ্যমান না থাকত, তবে তোমাদের অল্প কতিপয় লোক ব্যতীত সবাই শয়তানের অনুসরণ করতে শুরু করত। (সূরা নিসা ৮৩)

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.), যাহহাক ও আবু মা'আয (রা.)-এর মতে, এই আয়াতটি মুনাফিকদের সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। হযরত হাসান (রা.)সহ অধিকাংশের মতে, এ আয়াতটি দুর্বল ও কমজোর মুসলমানদের ব্যাপারে অবতীর্ণ।

আল্লামা ইবনে কাসীর এ আয়াতের সাথে সংশ্লিষ্ট ঘটনাবলি উদ্ধৃত করার পর বলেছেন যে, এ আয়াতের শানে নুযুল প্রসঙ্গে হযরত উমর ইবনে খাত্তাব (রা.)-এর হাদীসটি উল্লেখ করা বাঞ্ছনীয়। তা এই যে হযরত উমর (রা.)-এর নিকট একবার খবর পৌঁছাল যে রাসূলুল্লাহ (সা.) তাঁর বিবিগণকে তালাক দিয়েছেন। এ খবর শুনে তিনি নিজের বাড়ি থেকে বেরিয়ে মসজিদের দিকে এলেন এবং মসজিদের কাছাকাছি এসে শুনতে পারলেন যে, মসজিদের ভেতরেও লোকদের মধ্যে এই নিয়েই কথাবার্তা হচ্ছে। এসব লক্ষ করে তিনি বললেন, এ সংবাদটি অনুসন্ধান করে যাচাই করা দরকার। সে মতে তিনি রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নিকট উপস্থিত হলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি কি আপনার স্ত্রীদের তালাক দিয়েদিয়েছেন? রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন, না তো। হযরত উমর (রা.) বলেন, বিষয়টি অনুসন্ধান করার পর আমি মসজিদের দিকে ফিরে এলাম এবং দরজায় দাঁড়িয়ে ঘোষণা করলাম যে রাসূলুল্লাহ (সা.) তাঁর বিবিগণকে তালাক দেননি। আপনারা যা বলেছেন, তা ভুল। এরই পরিপ্রেক্ষিতে এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। (ইবনে কাসীর)

যাচাই না করে কোনো কথা রটনা করা মহাপাপ :

এই আয়াত দ্বারা প্রতীয়মান হচ্ছে যে যেকোনো শোনা কথা যাচাই, অনুসন্ধান ব্যতিরেকে বর্ণনা করা উচিত নয়। রাসূলে কারীম (সা.)-এর এক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে :

كفى بالمرء كذبا ان يحدث بكل ما سمع

কোনো লোকের পক্ষে মিথ্যবাদী হওয়ার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে সে কোনো রকম যাচাই না করেই সমস্ত শোনা কথা প্রচার করে। অপর এক হাদীসে তিনি বলেছেন :

من حدث بحديث وهو يرى انه كذب فهو احد الكاذبين

যে লোক এমন কোনো কথা বর্ণনা করে, যার ব্যাপারে সে জানে যে সেটি মিথ্যা, তাহলে সে দুজন মিথ্যাবাদীর একজন মিথ্যাবাদী। (ইবনে কাসীর)

উলুল আমর করা :

وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ

আয়াতে উল্লিখিত استنباط শব্দের প্রকৃত অর্থ হচ্ছে কূপের গভীরতা থেকে পানি তোলা। সে জন্যই কূপ খননকালে প্রথম যে পানি বেরোয় তাকে আরবীতে ماء مستنبط বলা হয়। কিন্তু এখানে উদ্দেশ্য হলো, কোনো বিষয়ের গভীরে গিয়ে তার প্রকৃত তাৎপর্য সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়া। (কুরতুবী)

উলুল আমর বা দায়িত্বশীল লোক নির্ণয়ে বিভিন্ন মতামত রয়েছে। হযরত হাসান, কাতাদা ও ইবনে আবী লায়লা (রহ.) প্রমুখের মতে, দায়িত্বশীল লোক বলতে উলামা ও ফকীহগণকে বোঝায়। হযরত সুদ্দী (রহ.) বলেন, এর দ্বারা শাসনকর্তা ও কর্তৃপক্ষকে বোঝায়। আল্লামা আবু বকর জাসসাস এতদুভয় মত উদ্ধৃত করার পর বলেছেন, সঠিক হলো এই যে দুটি অর্থই ঠিক। কারণ উলুল আমর শব্দটি উভয় ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। অবশ্য এতে কেউ কেউ সন্দেহ প্রকাশ করে থাকেন যে উলুল আমর বলতে ফকীহদের বোঝানো যেতে পারে না। তার কারণ الامر শব্দটি তার শাব্দিক অর্থের দিক দিয়ে সেসব লোককে বোঝায়, যাদের হুকুম বা নির্দেশ চলতে পারে। বলাবাহুল্য, এ কাজটি ফকীহদের নয়। প্রকৃত বিষয় হলো এই যে হুকুম চলার দুটি প্রেক্ষিত রয়েছে। এক. জবরদস্তিমূলক। এটা শুধু শাসকগোষ্ঠী বা সরকার দ্বারাই সম্ভব হতে পারে। দুই. বিশ্বাস ও আস্থার দরুন হুকুম মান্য করা। আর সেটা ফকীহরা অর্জন করতে পেরেছিলেন এবং যা সর্বযুগের মুসলমানদের অবস্থার দ্বারা প্রতিভাত হয়। ধর্মীয় ব্যাপারে সাধারণ মুসলমানরা নিজের ইচ্ছা ও মতামতের তুলনায় আলেম সম্প্রদায়ের নির্দেশকে অবশ্য পালনীয় বলে সাব্যস্ত করে থাকে। তা ছাড়া শরীয়তের দৃষ্টিতেও সাধারণ মানুষের জন্য আলেমদের হুকুম মান্য করা ওয়াজিবও বটে। সুতরাং তাদের ক্ষেত্রে উলুল আমর এ প্রয়োগ যথার্থ হবে। (আহকামুল কোরআন, জাসসাস)

আধুনিক সমস্যাবলি সম্পর্কিত বিষয়ে কিয়াস ও ইজতিহাদ :

এই আয়াত দ্বারা এ কথাও বোঝা যাচ্ছে যে যেসব বিষয়ে কোনো নস তথা কোরআন-হাদীসের সরাসরি কোনো বিধান নেই, সেগুলোর হুকুম ইজতিহাদ ও কিয়াসের রীতি অনুযায়ী কোরআনের আয়াত থেকে উদ্ভাবন করতে হবে। তার কারণ এ আয়াতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, আধুনিক কোনো বিষয়ের সমাধানকল্পে রাসূলে কারীম (সা.)-এর বর্তমানে তাঁর নিকট যাও। আর যদি তিনি বর্তমান না থাকেন, তাহলে ফকীহদের নিকট যাও। কারণ তাদেরই মধ্যে বিধান উদ্ভাবন করার মতো পরিপূর্ণ যোগ্যতা বিদ্যমান রয়েছে।

এই বর্ণনা দ্বারা কিছু বিষয় প্রতীয়মান হয়। যথা নস বা কোরআন-হাদীসের সরাসরি নির্দেশের অবর্তমানে উলামাদের কাছে যেতে হবে। দ্বিতীয়ত আল্লাহর নির্দেশ দুই রকম। কিছু হলো সরাসরি নস বা কোরআন-সুন্নাহভিত্তিক এবং কিছু হলো পরোক্ষ ও অস্পষ্ট, যা আল্লাহ তা'আলা আয়াতসমূহের গভীরে নিহিত রেখেছেন। তৃতীয়ত. এ ধরনের অন্তর্নিহিত মর্মগুলো কিয়াস ও ইজতিহাদের মাধ্যমে উদ্ভাবন করা উলামায়ে কেরামের একান্ত দায়িত্ব। চতুর্থত. এসব বিধানের ক্ষেত্রে আলেমদের অনুসরণ করা সাধারণ মানুষের অবশ্য কর্তব্য।

(তাফসীরে মাআরিফুল কোরআন অবলম্বনে)

কোরআন মজীদের পর সর্বাধিক পঠিত কিতাব

ফাজায়েলে আমাল নিয়ে এত বিভ্রান্তি কেন-৪০

ফাজায়েলে আমালে বর্ণিত হাদীসগুলো নিয়ে এক শ্রেণীর হাদীস গবেষকদের (!) অভিযোগ হলো, হাদীসগুলো সহীহ নয়। এগুলোর ওপর আমল করা যাবে না ইত্যাদি। কিন্তু বাস্তবতা কী? এরই অনুসন্ধানে এগিয়ে আসে মারকাযুল ফিকরিল ইসলামী বাংলাদেশ, বসুন্ধরা ঢাকার উচ্চতর হাদীস বিভাগের গবেষকগণ। তাঁদের গবেষণালব্ধ আলোচনা ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করছে মাসিক আল-আবরার। আশা করি, এর দ্বারা নব্য গবেষকদের অভিযোগগুলোর অসারতা প্রমাণিত হবে। মুখোশ উন্মোচিত হবে হাদীসবিদ্বেষীদের।

হাদীসের তাখরীজ ও তাহকীকের কাজটি আরম্ভ করা হয়েছে ফাজায়েলে যিকির থেকে। এখন ফাজায়েলে নামাযের উল্লিখিত হাদীসগুলোর নম্বর হিসেবে একটি হাদীস, এর অর্থ, তাখরীজ ও তাহকীক পেশ করা হয়েছে। উক্ত হাদীসের অধীনে হযরত শায়খুল হাদীস (রহ.) উর্দূ ভাষায় যে সকল হাদীসের অনুবাদ উল্লেখ করেছেন সেগুলোর ক্ষেত্রে (ক. খ. গ. অনুসারে) বাংলা অর্থ উল্লেখপূর্বক আরবীতে মূল হাদীসটি, হাদীসের তাখরীজ ও তাহকীক পেশ করা হয়েছে।

ফাজায়েলে নামায–দ্বিতীয় অধ্যায় :

জামা'আতের বর্ণনা

হাদীস নং-৩

نا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ، عَنْ أَبِي الْعُمَيْسِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْأَقْمَرِ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ :مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَلْقَ اللَّهَ غَدًا مُسْلِمًا فَلْيُحَافِظْ عَلَى هَؤُلَاءِ الصَّلَوَاتِ حِينَ يُنَادَى بِهِنَّ، فَإِنَّ اللَّهَ شَرَعَ لِنَبِيِّكُمْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُنَنَ الْهُدَى، وَإِنَّهُنَّ مِنْ سُنَنِ الْهُدَى، وَلَوْ أَنَّكُمْ صَلَّيْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ كَمَا يُصَلِّي هَذَا الْمُصَلِّي فِي بَيْتِهِ لَتَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ، وَلَوْ تَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ لَضَلَلْتُمْ، وَمَا مِنْ رَجُلٍ يَتَطَهَّرُ فَيُحْسِنُ الطُّهُورَ، ثُمَّ يَعْمِدُ إِلَى مَسْجِدٍ مِنْ هَذِهِ الْمَسَاجِدِ إِلَّا كُتِبَ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ يَخْطُوهَا حَسَنَةً، وَتَرْفَعُهُ بِهَا دَرَجَةً، وَتَحُطُّ بِهَا عَنْهُ سَيِّئَةٌ، وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنْهَا إِلَّا مُنَافِقٌ مَعْلُومُ النِّفَاقِ، وَلَقَدْ كَانَ الرَّجُلُ يُؤْتَى بِهِ يُهَادَى بَيْنَ رَجُلَيْنِ حَتَّى يُقَامَ فِي الصَّفِّ

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ الْعَبْدِيُّ، حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ بْنُ أَبِي زَائِدَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْرٍ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللهِ :لَقَدْ رَأَيْتُنَا وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنِ الصَّلَاةِ إِلَّا مُنَافِقٌ قَدْ عُلِمَ نِفَاقُهُ، أَوْ مَرِيضٌ، إِنْ كَانَ الْمَرِيضُ لَيَمْشِي بَيْنَ رَجُلَيْنِ حَتَّى يَأْتِيَ الصَّلَاةِ، وَقَالَ :إِنْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَّمَنَا سُنَنَ الْهُدَى، وَإِنَّ مِنْ سُنَنَ الْهُدَى الصَّلَاةَ فِي الْمَسْجِدِ الَّذِي يُؤَذَّنُ فِيهِ

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন, যে ব্যক্তি কাল কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলার দরবারে মুসলমানরূপে হাজির হতে চায়, সে যেন এই নামাযসমূহকে এমন স্থানে আদায় করার এহতেমাম করে, যেখানে আযান হয়। কেননা আল্লাহ তা'আলা তোমাদের নবী আলাইহিস সালামের জন্য এমন সুন্নাহসমূহ জারি করেছেন, যেগুলো সম্পূর্ণই হেদায়েত। এই সমস্ত সুন্নাতের মধ্যে জামা'আতের সহিত নামায আদায় করাও। যদি অমুক ব্যক্তির ন্যায় তোমরাও ঘরে নামায পড়তে আরম্ভ করো তবে তোমরা নবী (সা.)-এর সুন্নাত ত্যাগকারী হবে। আর এটি জেনে রাখো যে, যদি তোমরা নবীয়ে করীম (সা.)-এর সুন্নাতকে ত্যাগ করো তবে গোমরাহ হয়ে যাবে। আর যে ব্যক্তি উত্তমরূপে ওজু করে এবং মসজিদের দিকে অগ্রসর হয়, তাহার প্রতি কদমে একটি করে নেকী লেখা হবে এবং একটি করে গোনাহ মাফ করা হবে। আমরা নিজেদের অবস্থা এরূপ দেখতাম যে ব্যক্তি খোলাখুলি মুনাফেক, সেই কেবল জামা'আতে শামিল হতো না। অথবা কারো কঠিন রোগ হলে জামা'আতে হাজির হতে পারত না। অন্যথায় যে ব্যক্তি দুজনের ওপর ভর করে হেঁচড়িয়ে যেতে পারত তাকেও জামা'আতের সাথে কাতারে দাঁড় করে দেওয়া হতো।

(মুসলিম শরীফ ১/২৩২ হা. ১৪৮৮, সুনানে নাসাঈ ১/১০৮ হা. ৮৪৯, সুনানে আবু দাউদ ১/৮২ হা. ৫৫০, সুনানে ইবনে মাজাহ ১/৫৬ হা. ৭৭৭)

হাদীসটির মান সহীহ।

ক.

এ জন্যই রাসূল (সা.) ওয়াফাতকালের অসুস্থতার সময়ও ঠিক এই রূপ অবস্থা পরিলক্ষিত হয়েছিল। রোগ-যন্ত্রণায় বারবার

বেহুঁশ হয়ে পড়ছিলেন এবং হযরত আব্বাস (রা.) এবং অন্য একজন সাহাবীর সাহায্যে মসজিদে তাশরীফ নিয়ে গেলেন। তখন অবস্থা এই ছিল যে ভালোভাবে তাঁর পা মোবারক মাটিতে জমিয়ে রাখতে পারছিলেন না। তাঁরই নির্দেশে হযরত আবুবকর সিদ্দীক (রা.) নামায পড়াতে আরম্ভ করছিলেন। রাসূল (সা.) পৌঁছে জামা'আতে শরীক হলেন।

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ، قَالَ :حَدَّثَنِى أَبِى، قَالَ : حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، قَالَ :كُنَّا عِنْدَ عَائِشَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهَا، فَذَكَرْنَا الْمُوَاظَبَةَ عَلَى الصَّلاَةِ وَالتَّعْظِيمَ لَهَا، قَالَتْ :لَمَّا مَرِضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَضَهُ الَّذِى مَاتَ فِيهِ، فَحَضَرَتِ الصَّلاَةُ، فَأُذِّنَ فَقَالَ : مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ فَقِيلَ لَهُ :إِنَّ أَبَا بَكْرٍ رَجُلٌ أَسِيفٌ إِذَا قَامَ فِى مَقَامِكَ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُصَلِّىَ بِالنَّاسِ، وَأَعَادَ فَأَعَادُوا لَهُ، فَأَعَادَ الثَّالِثَةَ، فَقَالَ :إِنَّكُنَّ صَوَاحِبُ يُوسُفَ مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ، فَخَرَجَ أَبُو بَكْرٍ فَصَلَّى فَوَجَدَ النَّبِىُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ نَفْسِهِ خِفَّةً، فَخَرَجَ يُهَادَى بَيْنَ رَجُلَيْنِ، كَأَنِّى أَنْظُرُ رِجْلَيْهِ تَخُطَّانِ مِنَ الْوَجَعِ، فَأَرَادَ أَبُو بَكْرٍ أَنْ يَتَأَخَّرَ، فَأَوْمَأَ إِلَيْهِ النَّبِىُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ مَكَانَكَ، ثُمَّ أُتِىَ بِهِ حَتَّى جَلَسَ إِلَى جَنْبِهِ، قِيلَ لِلأَعْمَشِ :وَكَانَ النَّبِىُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى وَأَبُوبَكْرٍ يُصَلِّى بِصَلاَتِهِ، وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ بِصَلاَةِ أَبِى بَكْرٍ، فَقَالَ :بِرَأْسِهِ نَعَمْ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ بَعْضَهُ، وَزَادَ أَبُو مُعَاوِيَةَ جَلَسَ عَنْ يَسَارِ أَبِى بَكْرٍ، فَكَانَ أَبُو بَكْرٍ يُصَلِّى قَائِمًا

(বোখারী শরীফ ১/৯১ হা. ৬৬৪, মুসলিম শরীফ ১/৩১১ হা. ৪১৮, মুসনাদে আহমদ ৬/৩৪ হা. ২৪০৬১, মুসতাদরাকে হাকেম ৩/৫৬)

হাদীসটির মান : সহীহ

খ. হযরত আবু দারদা (রা.) বলেন, আমি রাসূল (সা.)-কে বলতে শুনেছি যে আল্লাহ তা'আলার ইবাদত করার সময় অন্তরে এরূপ ধারণা করবে যে, তিনি তোমার একেবারে সম্মুখে এবং তুমি তাঁকে দেখতে পাচ্ছ। তুমি নিজেকে মৃত ব্যক্তিদের মাঝে একজন মনে করবে। মজলুমের বদ দু'আ হতে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখবে। যদি তুমি এতটুকু শক্তি রাখো যে জমিনে হামাগুড়ি দিয়ে হলেও এশা ও ফজরের জামা'আতে হাজির হতে পারো, তবে তাতে অবহেলা করবে না।

وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْمُقْرِءِ، قَالَ :أَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثَنَا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِى بَكْرٍ، ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ، ثَنَا سَلَّامٌ يَعْنِى أَبَا الْأَحْوَصِ، عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ، عَنْ رَجُلٍ، مِنَ النَّخَعِ قَالَ :شَهِدْتُ أَبَا الدَّرْدَاءِ حِينَ حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ، قَالَ :أُحَدِّثُكُمْ حَدِيثًا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ " :اعْبُدِ اللهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، فَإِنْ كُنْتَ لَا تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، وَاعْدُدْ نَفْسَكَ فِى الْمَوْتَى، وَإِيَّاكَ وَدَعْوَةَ الْمَظْلُومِ فَإِنَّهَا مُسْتَجَابَةٌ، وَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَشْهَدَ الصَّلَاتَيْنِ الْعِشَاءَ وَالصُّبْحَ وَلَوْ حَبْوًا فَلْيَفْعَلْ

(আল মুজামুল কাবীর [তাবারানী] ২০/১৭৫ হা. ৩৭৪, হিলয়াতুল আওলিয়া ৮/২০২, আততারগীব ওয়াত তারহীব ১/১৫৪, মাজমাউয যাওয়ায়েদ ২/৪০ হা. ২১৪৯, শু'আবুল ঈমান [বায়হাকী] হা. ১০০৬০)

হাদীসটির মান : হাসান

গ. এক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, এশা এবং ফজরের নামায মুনাফেকদের জন্য অত্যন্ত কষ্টসাধ্য। যদি তাদের জানা থাকত যে জামা'আতের সওয়াব কত বেশি, তাহলে জমিনে হেঁচড়িয়ে হলেও এসে জামা'আতে শরীক হতো।

حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِى، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ، وَأَبُو كُرَيْبٍ، وَاللَّفْظُ لَهُمَا، قَالَا :حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِى صَالِحٍ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :إِنَّ أَثْقَلَ صَلَاةٍ عَلَى الْمُنَافِقِينَ صَلَاةُ الْعِشَاءِ، وَصَلَاةُ الْفَجْرِ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا، وَلَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِالصَّلَاةِ، فَتُقَامَ، ثُمَّ آمُرَ رَجُلًا فَيُصَلِّيَ بِالنَّاسِ، ثُمَّ أَنْطَلِقَ مَعِي بِرِجَالٍ مَعَهُمْ حُزَمٌ مِنْ حَطَبٍ إِلَى قَوْمٍ لَا يَشْهَدُونَ الصَّلَاةَ، فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ بِالنَّارِ

(বোখারী শরীফ ১/৯০ হা. ৬৫৭ মুসলিম শরীফ ১/২৩২ হা. ৬৫১, মুসনাদে আহমদ ২/৪৬৬ হা. ১০০২৯)

হাদীসটির মান : সহীহ

(চলবে ইনশাআল্লাহ)

দরসে ফিক্বহ

ক্রিপ্টো কারেন্সি "বিট কয়েনে" লেনদেনের শরয়ী বিধান

মুফতী শাহেদ রহমানী

মানব সমাজের যাবতীয় প্রয়োজন পূরণে আদিকাল থেকে যে বস্তুটি অনিবার্য ছিল তা হলো বিনিময় মাধ্যম। কোনো একটি নির্দিষ্ট বস্তুকে বিনিময় মাধ্যম নির্ধারণ করা ছাড়া পারস্পরিক লেনদেন করা ছিল অসম্ভব। তাই প্রাচীনকাল থেকে যুগে যুগে মানুষেরা বিভিন্ন বস্তুকে বিনিময় মাধ্যম নির্ধারণ করে লেনদেন করে আসছে। কোনো সময় গম, যব, চামড়া, কখনো স্বর্ণ-রুপা, কখনো অন্য কোনো ধাতব বস্তু। আদিকালে স্থান বিশেষ গোত্রীয়ভাবে ভিন্ন ভিন্ন বিনিময় মাধ্যম নির্ধারিত হতো। শিল্প বিপ্লবের পর ব্যাংকব্যবস্থা সূচিত হলে বিনিময় মাধ্যম হিসেবে পেপার নোটের প্রচলন শুরু হয়। পেপার নোট ইস্যুরও রয়েছে দীর্ঘ এক ইতিহাস ও প্রেক্ষাপট। একইভাবে রয়েছে এর ক্রমবিকাশ ও ক্রিয়ারও বহুকথন। যুগে যুগে ইসলামী ফকীহগণ বিশদ গবেষণা করেছেন পেপার নোটের শরয়ী বিধান নিয়ে। সম্প্রতি ডিজিটাল কারেন্সি নামে নব আবিস্কৃত এক বিনিময় মাধ্যমের সূচনা হয়েছে এবং এর মাধ্যমে বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে লেনদেনও হচ্ছে। এটিকে বলা হয় 'ক্রিপ্টোকারেন্সি'। ভিন্ন ভিন্ন নামে বেশ কিছু এ ধরনের কারেন্সি বাজারে এলেও সর্বাধিক প্রসিদ্ধ ও বহুল প্রচলিত হলো বিট কয়েন। এটির হাকীকত, ব্যবহার, এর দ্বারা লেনদেন, যাকাত আদায় ইত্যাদি বিষয়ে শরীয়তের বিধান কী তা নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা আজকের দরসে ফিকহে।

নামের ভিন্নতা, ভিন্ন গঠন-প্রণালী ও ব্যবহার-পদ্ধতি সত্ত্বেও যেহেতু এটি কারেন্সি বা মুদ্রা ও বিনিময় মাধ্যম তাই বর্তমানে প্রচলিত মুদ্রা–পেপার নোটের হাকীকত ও তার শরয়ী বিধানের ব্যাপারে সম্যক ধারণা গ্রহণ সমীচীন। তাই প্রথমে সংক্ষিপ্ত আকারে তা উপস্থাপন করা হলো।

অর্থের (Money) সংজ্ঞা :

যে বস্তু প্রচলিত প্রথানুযায়ী বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার হয় এবং মূল্যমানের পরিমাপক হয়, যার মাধ্যমে সম্পদ সংরক্ষণ করা যায়, তাকে অর্থ বলে। এই তিন বৈশিষ্ট্য যে বস্তুর মধ্যে পাওয়া যায় তাকে অর্থনীতির পরিভাষায় আরবীতে 'نـــقـــد' বাংলায় 'অর্থ' এবং ইংরেজিতে Money বলে। সম্পদ সংরক্ষণের অর্থ হচ্ছে, কারো কাছে পণ্যদ্রব্য আছে, তার মূল্য কমবেশি হতে থাকে। তা ছাড়া যেকোনো সময় তার কোনো ক্রেতা পাওয়া নিশ্চিত নয়। এ কারণে তার সম্পদ পুরোপুরিভাবে সংরক্ষিত নয়। তার পরিবর্তে যদি অর্থ রাখা হয় তাহলে সাধারণ অবস্থায় তা দ্বারা সম্পদ সংরক্ষিত থাকে। অর্থাৎ অস্বাভাবিক অবস্থা ব্যতিরেকে তার নিজস্ব মূল্য এক রকম থাকে। তা দ্বারা যেকোনো বস্তু যখন ইচ্ছা ক্রয় করা যেতে পারে।

অর্থ ও মুদ্রার মধ্যে পার্থক্য :

যে জিনিস দ্বারা বিনিময় করা যায়, মূল্যের পরিমাপ করা যায় এবং মূল্যের সংরক্ষণও হয়, তাকে অর্থ বলে। তবে আইনগতভাবেও তাকে বাধ্যতামূলক বিনিময় মাধ্যম হিসেবে স্থির করা জরুরি নয়। যেমন–চেক বা প্রাইজ বন্ড ইত্যাদি দলিল দ্বারা মানুষ বিনিময় করে থাকে। কিন্তু যদি কোনো ব্যক্তি প্রাইজ বন্ডের মাধ্যমে বিল পরিশোধ করে আর অন্যজন তার প্রাপ্য প্রাইজ বন্ডের মাধ্যমে নিতে অস্বীকৃতি জানায়, তাহলে তাকে আইনগতভাবে তা গ্রহণ করতে বাধ্য করা যায় না। আর মুদ্রা হলো এমন অর্থ, যা বিশেষ কোনো দেশে আইনগতভাবে বিনিময় মাধ্যম হিসেবে নির্ধারণ করা হয়েছে, যেমন টাকা। যদি কোনো ব্যক্তি টাকা পরিশোধ করে তাহলে আইনগতভাবে তা গ্রহণ করতে বাধ্য করা যাবে। এরূপ আইনগত মুদ্রাকে আরবীতে 'عملة قانونية' বাংলায় বিহিত মুদ্রা এবং ইংরেজিতে Legal Tender বলে। এগুলো আবার দুই প্রকার। এক প্রকার মুদ্রা, যা দ্বারা একটা নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত আইনগতভাবে পরিশোধ করা যায়। তার চেয়ে অতিরিক্ত প্রদান করা হলে গ্রহণ করতে বাধ্য করা যাবে না, যেমন পঁচিশ পয়সার মুদ্রা। যদি কেউ পঁচিশ পয়সার মুদ্রা দ্বারা বড় ঋণ পরিশোধ করতে চায় তাহলে গ্রহীতা আইনগতভাবে তা গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানিয়ে তার ঋণ টাকায় পরিশোধ করার দাবি করতে পারে। তাকে আরবীতে 'عملة قانونية محدودة' বাংলায় সসীম বিহিত মুদ্রা এবং ইংরেজিতে Limited Legal Tender বলে, দ্বিতীয় প্রকার হলো

যাতে আইনগতভাবে ঋণ পরিশোধে কোনো সীমা নির্ধারিত থাকে না। এটি আরবীতে عملة قانونية غير محدودة ইংরেজিতে Unlimited Legal Tender বলে। যেমন ধাতব বা কাগজী মুদ্রা।

মুদ্রার ক্রমবিকাশ ও বিভিন্ন মুদ্রাব্যবস্থা : প্রাচীনকালে মানুষের মধ্যে পণ্যের বিনিময়ে পণ্য বিক্রির প্রথা চালু ছিল, যাকে বিনিময়, 'مقايضة' বা Barter বলা হয়, কিন্তু তাতে কতগুলো সমস্যা ছিল। যেমন পণ্য স্থানান্তর বা পরিবহন ছিল একটা বড় সমস্যা। এ পদ্ধতিতে একই স্থানে জোগান ও চাহিদার সম্মিলন কম হতো। যেমন এক ব্যক্তি গম দিয়ে কাপড় নিতে চায়, কিন্তু কাপড়ওয়ালা গম নিতে আগ্রহী নয়। পণ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র এককে বিভক্ত করে তা কারবারের ভিত্তি বানানো ছিল কঠিন। 'مقايضة' (Barter)-এর পরে কিছু গুরুত্বপূর্ণ বস্তুকেই অর্থ হিসেবে নির্ধারণ করা হয়েছে। যেমন গম, যব, চামড়া ইত্যাদি। এরপর স্বর্ণ ও রুপা অর্থ হিসেবে নির্ধারণ করা হয়েছে। কারণ এটা বিশ্বব্যাপী গ্রহণযোগ্য ছিল, তা পরিবহন এবং স্থানান্তরও ছিল সহজসাধ্য। প্রাচীন যুগে মুদ্রাঙ্কন ছাড়াই স্বর্ণের পরিমাণের ভিত্তিতে বিনিময় হতো। তারপর মুদ্রা তৈরি করার প্রথা সূচনা হয়। প্রথম দিকে প্রত্যেক ব্যক্তিরই মুদ্রা বানানোর অনুমতি ছিল। সে যুগের ব্যবস্থাকে স্বর্ণমান, আরবীতে 'قاعدة الذهب' এবং ইংরেজিতে Gold Standard বলা হয়। এরপর স্বর্ণ ছাড়া রুপার মুদ্রাও তৈরি শুরু হয়। যে মুদ্রাব্যবস্থায় স্বর্ণ ও রুপা উভয় ধরনের মুদ্রা তৈরি করা হতো তাকে দ্বি-ধাতু মান বা Bi-Metallic Standard এবং আরবীতে 'نظام المعدنين' বলা হয়। তারপর এমন এক যুগ আসে, মানুষ স্বর্ণ-রুপার মুদ্রা মহাজনদের নিকট আমানত রেখে দিত। আর মহাজন আমানতের দলিল হিসেবে রসিদ লিখে দিত। প্রয়োজনের মুহূর্তে সে রসিদ দেখিয়ে মহাজন থেকে তার স্বর্ণ ফেরত নিয়ে নিত। তারপর আস্তে আস্তে লোকেরা মহাজনের দেওয়া রসিদ দিয়ে পণ্য ক্রয় শুরু করে দিল। অর্থাৎ ক্রেতা আগে মহাজন থেকে স্বর্ণ উত্তোলন করে বিক্রেতাকে দেওয়া এবং বিক্রেতা স্বর্ণ নিয়ে পুনরায় মহাজনের কাছে রাখার পরিবর্তে ক্রেতা বিক্রেতাকে স্বর্ণের রসিদ প্রদান করত। যার অর্থ দাঁড়াত, রসিদের স্বর্ণ বিক্রেতার কাছে স্থানান্তরিত হয়ে গেছে। এভাবে রসিদের মাধ্যমে লেনদেন শুরু হয়ে যায় এবং মহাজনদের থেকে স্বর্ণ ফেরত আনার অবকাশ কমতে থাকে। মহাজনরা যখন দেখল মানুষেরা স্বর্ণ উত্তোলন করছে না তখন তাদের কাছে রাখা স্বর্ণ অন্যকে ঋণ দিতে আরম্ভ করল। এভাবে নোট ও ব্যাংকিংব্যবস্থার সূচনা হয়। অর্থাৎ মহাজনদের জারীকৃত রসিদ হয়ে গেল নোট। পূর্বে প্রত্যেক ব্যক্তি নোট প্রচলন করতে পারত। কিন্তু সে সময় বিহিত মুদ্রা (Legal Tender) ছিল না। শুধু মানুষের পারস্পরিক ব্যবহারের কারণে গ্রহণযোগ্য ছিল। এ গ্রহণযোগ্যতা ও সহজসাধ্যতার প্রেক্ষিতে পরবর্তীতে নোটকে বিহিত মুদ্রা (Legal Tender) স্থির করা হয়েছে, কিন্তু প্রত্যেক ব্যক্তির বিহিত মুদ্রার মানসম্পন্ন নোট প্রচলন করার অনুমতি ছিল না। সরকারের অনুমোদিত (Authorised) প্রতিষ্ঠানই (ব্যাংক) তা প্রবর্তন করতে পারত। আগে সাধারণ বাণিজ্যিক ব্যাংকও নোট প্রবর্তন করতে পারত। পরে এ অধিকার শুধু কেন্দ্রীয় ব্যাংকে সীমাবদ্ধ করে দেওয়া হয়। নোট প্রচলন হওয়ার পর কয়েক যুগ অতিবাহিত হয়ে গেছে। এক যুগ এমন ছিল, যখন নোটের বিপরীতে শতভাগ স্বর্ণ থাকত। যত স্বর্ণ থাকত আইনগতভাবে তত নোট জারি করার বাধ্যবাধকতা ছিল। এ ব্যবস্থাকে স্বর্ণপিণ্ড মান, আরবীতে 'قاعدة سبائك الذهب' এবং ইংরেজিতে Gold Bullion Standard বলে। তারপর যখন দেখা গেল স্বর্ণ নেওয়ার জন্য মানুষ খুব কম আসে, তখন নোটের বিপরীতে স্বর্ণের হার কমিয়ে দেওয়া হলো। এতে আনুপাতিক হার পরিবর্তিত হতে, অর্থাৎ নোটের বিপরীতে রাখা স্বর্ণের শতকরা হার কমতে থাকে। যে নোটের বিপরীতে শতভাগ স্বর্ণ না থাকে তাকে 'نقود الثقة' বা Fiduciary Money বলে। তারপর স্বর্ণের হার কমতে কমতে শূন্যের কোঠায় ঠেকে। অন্তত দেশীয় লেনদেনের ক্ষেত্রে নোটের বিপরীতে স্বর্ণের মজুদ থাকা জরুরি থাকেনি। এমন নোটকে প্রতীকী মুদ্রা 'النقود الرمزية' (Token Money) বলে। এ মুদ্রার আইনসম্মত মূল্য প্রকৃত মূল্যের প্রতিনিধিত্ব করে না। যেমন এক শ টাকার নোটের আইনসম্মত মূল্য এক শ টাকা, কিন্তু তার নিজস্ব মূল্য কিছুই নয়। কিছুকাল ধরে 'النقود الرمزية'-এর প্রচলন এত ব্যাপক ছিল যে, বেশির ভাগ দেশ তার নোটগুলোকে ডলারের সাথে সম্পৃক্ত করে রেখেছিল, যেন তাদের নোটের বিপরীতে ডলারের ভিত্তি ছিল। আর যেহেতু আমেরিকা ডলারের বিনিময়ে স্বর্ণ দেওয়ার স্বীকারোক্তি দিয়েছিল, এ কারণে ডলারের বিপরীতে স্বর্ণ ছিল। এভাবে অন্য দেশের নোটও পরোক্ষভাবে স্বর্ণের সাথে সম্পৃক্ত ছিল। কিন্তু ১৯৭১ সালে আমেরিকাও স্বর্ণের সাথে ডলারের সম্পৃক্ততা শেষ করে দেয়। এভাবে এখন আর কোনো নোটের বিপরীতে কোনো স্বর্ণ-রুপা

নেই। এখন নোট শুধু একটা পারিভাষিক মূল্য, যা কেবল ক্রয় ক্ষমতার প্রতিনিধিত্ব করে।

কাগজী নোটের ভিত্তি ও তার ফিকহী বিধান :

উল্লিখিত আলোচনা থেকে পরিষ্কার হয়েছে, কাগজী নোটের ওপর দিয়ে কয়েক যুগ অতিবাহিত হয়ে গেছে। প্রথমে তার বিপরীতে পরিপূর্ণরূপে স্বর্ণ থাকত, যাকে বলা হতো স্বর্ণপিণ্ড মান (Gold Bullion Standard)। তারপর এল Fiduciary Money-এর যুগ। তার বিপরীতে পরিপূর্ণরূপে স্বর্ণ না থাকলেও নির্দিষ্ট অনুপাতে স্বর্ণ থাকত। তারপর একসময় এল যখন সব মুদ্রা ডলারের সাথে আর ডলার স্বর্ণের সাথে সম্পৃক্ত হলো। অবশেষে ১৯৭১ সালের পর আমেরিকাও স্বর্ণ প্রদান করতে অস্বীকার করে। এখন এ নোটের বিপরীতে কোনো কিছুই আর নেই। নোটের ওপর লিখিত বক্তব্য 'চাহিবামাত্র ইহার বাহককে এত টাকা দিতে বাধ্য থাকিবে' অর্থহীন হয়ে পড়েছে। এখন অবস্থা এমন হয়েছে, এটা বিনিময়ের মাধ্যম হওয়াটা কেবল পরিভাষা। তার বিপরীতে কোনো কিছুই নেই।

বর্তমান অবস্থায় কাগজী নোটের ভিত্তি কী? এর দুটি ব্যাখ্যা করা হয় :

১. অধিকাংশ অর্থনীতিবিদ বলেন, নোটের বিপরীতে এ জন্য স্বর্ণ রাখা হতো, স্বর্ণ বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে প্রসিদ্ধ হয়ে পড়েছিল। সব দেশে সর্বত্র তার ভিত্তিতে ব্যবসা-বাণিজ্য চলতে পারত। স্বর্ণকে মাধ্যম না বানিয়ে এ উদ্দেশ্য যদি কাগজী নোট দিয়ে হাসিল হয় এবং এটা বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে প্রসিদ্ধ হয়ে যায় তাহলে স্বর্ণকে মাধ্যম বানানোর প্রয়োজন নেই। এ মতানুসারে নোট একটি বিশেষ ক্রয়ক্ষমতার নাম। অর্থাৎ এ নোট দ্বারা এত মূল্যের পণ্য ক্রয় করা যেতে পারে। অতএব এখন নোটের বিপরীতে স্বর্ণের পরিবর্তে অনির্দিষ্ট বিভিন্ন পণ্যের সমষ্টি আছে। একে ইংরেজিতে Basket of Goods এবং আরবীতে 'سلة البضائع' বলে।

২. দ্বিতীয় ব্যাখ্যা যেটা ফিকহী দৃষ্টিভঙ্গির খুব কাছাকাছি, সেটা হলো, নোটকে পারিভাষিক মুদ্রা এবং প্রচলিত অর্থ হিসেবে নির্ধারিত করা হয়েছে। অর্থাৎ যদিও এ কাগজের নিজস্ব কোনো মূল্য নেই, কিন্তু পরিভাষাগতভাবে তাকে একটি বিশেষ মূল্যমানের বিনিময় মাধ্যম নির্ধারণ করা হয়েছে।

নোটের ফিকহী ভিত্তি :

নোটের ফিকহী ভিত্তি কী? এ ব্যাপারে উলামায়ে কেরামের কয়েকটি দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে :

১. নিকট অতীতে উপমহাদেশের অধিকাংশ উলামায়ে কেরামের মত ছিল, নোট নিজে কোনো সম্পদ নয়; বরং ঋণের রসিদ। কাউকে নোট প্রদান করা মানে ঋণ অর্পণ করা। এর ওপর কায়েকটি মাসআলা নির্গত হয়। যেমন নোট প্রদান করলে যাকাত আদায় হবে না, যতক্ষণ না ফকির তা দিয়ে কোনো বস্তু ক্রয় করে। নোট দ্বারা স্বর্ণ ও রুপার ক্রয়-বিক্রয় জায়েয হবে না। কারণ নোটও স্বর্ণের প্রতিনিধিত্ব করে। সুতরাং এটা মুদ্রা বিক্রয় (বায়ে ছারফ) হলো। যে নোট নিয়েছে সে এখনো স্বর্ণ হস্তগত করেনি। সুতরাং 'تقابض فى المجلس' (এক আসরেই হস্তগতকরণ) হয়নি। অথচ এটা বায়ে ছারফ জায়েয হওয়ার জন্য শর্ত; বরং এ মতানুযায়ী পরস্পরে দুটি নোট বিনিময় করাও জায়েয হবে না। কারণ এটা 'بيع الدين بالدين' (ঋণের বিনিময়ে ঋণ বিক্রি), بيع الكالئ بالكالئ যেটা নাজায়েয।

এ দৃষ্টিভঙ্গি কোনো এক যুগে সঠিক ছিল, কিন্তু এখন কয়েকটি কারণে সঠিক নয়। কারণ এখন নোটের বিপরীতে স্বর্ণ থাকে না; বরং তাকেই মূল্য স্থির করা হয়েছে। সুতরাং তাকে ঋণের রসিদ বলা কঠিন।

২. আরেক অভিমত হচ্ছে, এক টাকার নোট সম্পদ, আর অন্য নোট তার রসিদ। এ অভিমত দর্শনগত দিক থেকে সঠিক হতে পারে। কারণ এক টাকার নোটের এবং অন্যান্য নোটের মধ্যে পার্থক্য আছে। এক টাকার নোট সরকার আর অন্যান্য নোট কেন্দ্রীয় ব্যাংক প্রবর্তন করে। বড় নোটের মধ্যে লেখা থাকে, 'চাহিবামাত্র ইহার বাহককে এত টাকা দিতে বাধ্য থাকিবে'। এক টাকার নোটে এরূপ লেখা থাকে না। সরকারের যখন অর্থের প্রয়োজন হয় তখন সে কেন্দ্রীয় ব্যাংক থেকে ঋণ গ্রহণ করে। কেন্দ্রীয় ব্যাংক নোট ছেপে ঋণ প্রদান করে। এক টাকার নোট মাল আর অন্যান্য নোট তার রসিদ–এ পার্থক্যের এ ব্যাখ্যা ছাড়া অন্য কোনো ব্যাখ্যা দৃশ্যত সম্ভব নয়, কিন্তু কার্যত ব্যাপার তা নয়। কারণ বড় নোট এটা দেখে ছাপানো হয় না যে, এক টাকার নোট কী পরিমাণে আছে, সেই পরিমাণ বড় নোট ছাপানো হবে। বড় নোটের সাথে এক টাকার নোটের কোনো সম্পর্ক থাকে না।

তা ছাড়া কোনো বস্তুকে প্রচলিত মূল্য নির্ধারণ করার জন্য এ ধরনের কোনো শর্ত নেই যে, সেটা কী বস্তু। সুতরাং যদি কোনো রসিদকে মূল্য স্থির করা হয় তাহলে তার ওপরও প্রচলিত মূল্যের হুকুম জারি হওয়া উচিত।

৩. অধিকাংশ আরব উলামায়ে কেরামের মত হলো, নোট স্বর্ণ ও রুপার স্থলাভিষিক্ত। স্বর্ণ ও রুপার যে বিধান নোটেরও সে বিধান। তার কারণ হলো, সোনা-রুপা এখন আর বিনিময়ের

মাধ্যম থাকেনি। সোনা-রুপার জায়গা এখন দখল করেছে নোট। সুতরাং যাকাত, বায়ে ছারফ, সুদ ইত্যাদি সব মাসআলায় নোটের হুকুম হবে সোনা-রুপার মতো। আরব আলেমদের কেউ কেউ তো এত দূর পর্যন্ত বলেছেন, সোনা-রুপা আর এখন মূল্য নয়; বরং পণ্যসামগ্রী। তার ওপর পণ্যের হুকুম জারি হবে। এ অভিমতটা এ দৃষ্টিভঙ্গির ভিত্তিতে সৃষ্টি হয়েছে যে, কোনো বস্তুই সৃষ্টিগতভাবে মূল্য নয়। কোনো বস্তুকে মানুষ বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করে নিলে সেটা মূল্য হয়। এ গ্রহণযোগ্যতা শেষ হয়ে গেলে তার এ দৃষ্টিভঙ্গিও সঠিক হয়ে যাবে।

এ দৃষ্টিভঙ্গিও সঠিক মনে হয় না। কারণ সোনা-রুপা এবং নোটের মধ্যে পার্থক্য আছে। সোনা-রুপাকে সৃষ্টিগত মূল্য বলা হোক বা না হোক, সেটা ভিন্ন কথা, কিন্তু এটা স্থিরীকৃত যে সোনা-রুপাকে শরীয়ত প্রাকৃতিক মূল্য নির্ধারণ করেছে। প্রাকৃতিক মূল্য হওয়ার অর্থ হচ্ছে, তার মূল্যমান প্রথাগতভাবে তার বিনিময় মাধ্যম হিসেবে গ্রহণযোগ্য হওয়ার সাথে সম্পৃক্ত নয়। মানুষ তাকে বিনিময় মাধ্যম গণ্য করুক বা পণ্য হিসেবে ব্যবহার করুক, শরয়ীভাবে তার বিধান হবে অভিন্ন। এ কারণে সোনা-রুপার অলঙ্কার সোনা-রুপার বিনিময়ে বিক্রি করলে তার ওপরও মুদ্রা বদলের বিধান প্রযোজ্য হবে। অথচ এখানে এটা বিনিময় মাধ্যম নয়। বোঝা গেল, সোনা-রুপা প্রাকৃতিক এবং শরয়ী মূল্য। আর নোট প্রচলিত মূল্য। সুতরাং নোটকে সোনা-রুপার স্থলাভিষিক্ত নির্ধারণ করাও সঠিক নয়। এটা বলাও ঠিক নয়, সোনা-রুপার মূল্যমান শেষ হয়ে গেছে।

৪. সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি হলো, নোট রসিদ নয় বরং সম্পদ, সোনা-রুপার ন্যায় প্রাকৃতিক মূল্য নয় বরং প্রচলিত মূল্য। এর বিধান হবে ফুলুস (প্রচলিত মুদ্রা)-এর ন্যায়। এ দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে নোটের মাসআলার সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা নিম্নরূপ :

নোট যেহেতু নিজেই সম্পদ; সুতরাং তা প্রদান করলে যাকাত আদায় হয়ে যাবে। পরস্পরের মধ্যে তার বিনিময় বায়ে ছারফ (মুদ্রা বেচাকেনা) হবে না। যখন নোটের বিনিময় বায়ে ছারফ নয় বলে জানা গেল, তখন তার পরস্পর বিনিময়ের বিধান কী হবে? এর উত্তর হচ্ছে, নোট বিনিময়ের দুটি রূপ আছে : এক হলো, একই দেশের দুটি নোটের বিনিময় হওয়া। যেমন বাংলাদেশি এক শ টাকার নোটের বিনিময় হচ্ছে দশ টাকার দশটি নোটের সাথে। দ্বিতীয় রূপ হচ্ছে, এক দেশের মুদ্রার সাথে অন্য দেশের মুদ্রার বিনিময় হওয়া।

প্রথম অবস্থার হুকুম হলো, এটা যেহেতু বায়ে ছারফ নয়, এ কারণে একই আসরে হস্তগত করা (تـقـابـض فـى المجلس) জরুরি না হলেও বিনিময়কৃত দুটির যেকোনো একটি মজলিসে হস্তগত করা জরুরি। যাতে ঋণের বিনিময়ে ঋণ বিক্রি (بيع الدين بالدين) না হয়ে যায়। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, এ বিনিময়ে কমবেশি জায়েয আছে কি না? যেমন এক শ টাকা দিয়ে নব্বই টাকার বিনিময় জায়েয হবে কি না? এর উত্তর হচ্ছে, যদি উভয় বদল অনির্ধারিত হয়, তাহলে হানাফী ইমামত্রয়ের নিকট কমবেশি জায়েয হবে না। কারণ ফুলুসের (মুদ্রা) মধ্যে উৎকৃষ্টতা নিকৃষ্টতা ধর্তব্য নয়। সুতরাং এটা নিশ্চিতভাবে সমান সমান হওয়া জরুরি এমন বস্তুর দৃষ্টান্ত। এখানে একটি বদলের বৃদ্ধি অন্য বদলের উৎকৃষ্ট গুণের মোকাবেলা হতে পারে না। কারণ উৎকৃষ্টতার গুণ অর্থহীন। সুতরাং এ বৃদ্ধি হবে বিনিময়বিহীন, তাকেই সুদ বলে। যদি উভয় বদল নির্দিষ্ট হয় তাহলে ইমাম আবু হানীফা (রহ.) ও ইমাম আবু ইউসুফ (রহ.)-এর মতে কমবেশি জায়েয হবে। তাঁদের মতে, চুক্তিবদ্ধ দুই পক্ষের নির্দিষ্ট করার কারণে তার মূল্যমান বাতিল হয়ে এখন এটা পণ্য হয়ে গেছে। এ কারণে তার মধ্যে কমবেশি জায়েয আছে। ইমাম মুহাম্মদ (রহ.)-এর মতে, এ অবস্থায়ও কমবেশি জায়েয নেই। কারণ তাদের নির্দিষ্ট করার কারণে তার মূল্যমান বাতিল হয় না। বর্তমানে ইমাম মুহাম্মদ (রহ.)-এর মতানুসারেই ফতওয়া দেওয়া উচিত। কারণ শায়খাইনের মত গ্রহণ করা হলে সুদের রাস্তা খুলে যাবে। সুতরাং পূর্ববর্তী ফকীহদের মধ্যেও তার দৃষ্টান্ত বর্তমান আছে। প্রাচ্যের ফকীহগণ 'عـدالى' এবং 'غـطـارفة'-এর মধ্যে কমবেশি করা হারাম ফতওয়া দিয়েছিলেন। অথচ তাতে প্রতারণার প্রাধান্য থাকত। আর এমন নগদের ক্ষেত্রে আসল মাযহাব অনুযায়ী কমবেশি করা জায়েয। সুদের রাস্তা বন্ধ করার জন্য কমবেশি করা হারাম স্থির করা হয়েছে। তেমনি ফুলুসের মধ্যে বেশি-কমের ক্ষেত্রেও ইমাম মুহাম্মদ (রহ.)-এর মতের ওপর ফতওয়া দেওয়া উচিত। সুতরাং একই দেশের নোট বিক্রয়ে কমবেশি জায়েয নেই, সমান সমান হওয়া জরুরি। আর এ সমতা নোট গণনার ভিত্তিতে নয়; বরং তার ওপর লিখিত মূল্যের (Face Value) ভিত্তিতে হবে।

দ্বিতীয় পদ্ধতির হুকুম হলো, দুই দেশের মুদ্রা বিনিময়ে হ্রাস-বৃদ্ধি করা জয়েয আছে। তবে শর্ত হলো, বিনিময়কৃত দুটির কোনো একটি হস্তগত হতে হবে। কারণ দুই দেশের মুদ্রার জাতীয়তা ভিন্ন। আর নোট তো মূল উদ্দেশ্য নয়; বরং এটা বিশেষ এক ক্রয়ক্ষমতার প্রতিনিধিত্ব করে। আর প্রত্যেক দেশের

কারেন্সির ক্রয়ক্ষমতা হয় বিভিন্ন রকম। সুতরাং প্রত্যেক দেশের কারেন্সি পৃথক জাতীয় (জিন্‌স) বলে গণ্য হবে এবং তার পারস্পরিক লেনদেনে হ্রাস-বৃদ্ধি জায়েয হবে।

সরকারও অন্য দেশের মুদ্রার সাথে নিজ দেশের মুদ্রার রেট নির্ধারণ করে দেয়। এ রেটের থেকে কমে-বেশি লেনদেন করা সুদ হবে না। তবে বেআইনি হওয়া এবং বৈধ বিষয়ে রাষ্ট্রীয় আইনের অনুসরণ না করার কারণে গোনাহ হবে।

বিট কয়েনের পরিচিতি :

বিট কয়েনের হাকীকত সম্পর্কে মুফতী আব্দুল্লাহ মাসুম তাঁর এক প্রবন্ধে লেখেন, বিট কয়েন : 'বিট কয়েন' বর্তমানে আলোচিত একটি ক্রিপ্টোকারেন্সি (Cryptocurrency)। 'ক্রিপ্টো' মানে অদৃশ্য, গোপন, সিক্রেট। কারেন্সি মানে মুদ্রা। সহজে বললে এমন একটি মুদ্রা, যা অদৃশ্য, সংকেত বা নাম্বারের মাধ্যমে প্রকাশ পায়, এর না আছে নিজস্ব বস্তুগত কোনো আকার, না তা স্পর্শযোগ্য। তেমনিভাবে এর না আছে নিজস্ব কোনো মূল্যমান বা ফায়দা (Intrinsic Value)। আর 'বিট কয়েন'-এ bit শব্দের অনেক অর্থ। যেমন, টুকরো, ছোট অংশ, অল্প, কিছুক্ষণ। এর আরেক অর্থ, কম্পিউটারে ব্যবহৃত সংক্ষিপ্ততম তথ্য। এখানে শেষোক্ত অর্থই উদ্দেশ্য। যেহেতু এটি কম্পিউটারের ক্ষুদ্র তথ্যকে ব্যবহার করে তৈরি হয়, তাই একে 'বিট কয়েন' বলা হয়।

ইন্টারনেটে ক্রিপ্টোকারেন্সি অনেক আছে। যেমন, Ripple, Ethereum ইত্যাদি। এসবের মধ্যে বর্তমানে 'বিট কয়েন' সর্বপ্রথম ও সবচেয়ে আলোচিত ক্রিপ্টোকারেন্সি। এসব ক্রিপ্টোকারেন্সির কিছু কমন বৈশিষ্ট্য রয়েছে এবং কিছু নিজস্ব বৈশিষ্ট্য রয়েছে, যা কারেন্সির প্রস্তুতকারীগণ নির্ণয় করে থাকেন। বিশেষজ্ঞদের মতে, বিট কয়েন মূলত একটি ক্রিপ্টোকারেন্সি, যা ভার্চুয়াল মুদ্রা। এর শারীরিক (Physical) বৈশিষ্ট্য নেই। স্পর্শযোগ্য নয়। নিজস্ব কোনো মূল্যও (Intrinsic Value) নেই। এটি বিশেষ হার্ডওয়্যার দ্বারা নির্দিষ্ট প্রক্রিয়ায় সংকেত আকারে তৈরি হয়। অন্য কথায়, এটি একটি ভার্চুয়াল টোকেন, যাকে এর প্রস্তুতকারীগণ বিনিময়ের মাধ্যম বা মুদ্রা হিসেবে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে তৈরি করেছেন। অন্য যেকোনো পণ্যের ন্যায় বিট কয়েনেরও চাহিদা ও জোগানের ভিত্তিতে অন্যান্য ফেইথ (Faite) মুদ্রার সাথে এর মূল্যমান কমবেশি হয়ে থাকে। ২০০৮ ইং সালের নভেম্বরে এক অজ্ঞাত সংস্থা বা ব্যক্তি কর্তৃক একটি আর্টিকেল প্রকাশিত হয়। যার ছদ্মনাম 'সাতোশী নাকামোতো (Satoshi Nakamoto)O। এই আর্টিকেলের ভিত্তিতে ২০০৯ ইং সালের জানুয়ারিতে প্রথম বিট কয়েনের ঘোষণা দেওয়া হয়। ধারণা করা হয়, এই ছদ্মনাম বিশিষ্ট ব্যক্তি সর্বোচ্চ ২১ মিলিয়ন বিট কয়েনের মধ্যে মাত্র ৫% উৎপন্ন করেছে। এটি করা হয়েছে মাইনিং পদ্ধতি ব্যবহার করে।

যেভাবে তা তৈরি হয় : কাগুজে মুদ্রা তৈরি হয় টাকা ছাপানোর মেশিনে। সরকার একে অনুমোদন করে। নিয়ন্ত্রণ করে। এভাবে এতে সৃষ্টি হয় ক্রয়ক্ষমতা (Purchasing power)। কিন্তু বিট কয়েন তৈরি হয় সম্পূর্ণ ভিন্নভাবে। এটি তৈরির প্রধান উৎস 'ব্লক চেইন (Block chain) নামক এক উন্নত প্রযুক্তি। প্রযুক্তিটি আবিষ্কার হয়েছে ১৯৯১ ইং সালে। ব্লক চেইন (Block chain) একটি প্রযুক্তিগত ফ্রেমওয়ার্ক, যার ওপর বিট কয়েন তৈরি করা হয়েছে। ব্লক চেইন একটি চমৎকার প্রযুক্তি। সংক্ষেপে তার বিবরণ দেওয়া হলো।

ব্লক চেইন প্রযুক্তি : সাধারণত আমরা আরেকজনের কাছে টাকা পাঠাই তৃতীয় কোনো মাধ্যমে। যেমন–ব্যাংক, পোস্ট অফিস ইত্যাদি। তদ্রূপ জমির মালিকানা হস্তান্তর করি ভূমি অধিদপ্তরের মধ্যস্থতায়। এসব তৃতীয় পক্ষ লেনদেনে মধ্যস্থতা করার পাশাপাশি অর্থ-সম্পদের নিরাপত্তাও প্রদান করে। আমাদের লেনদেনের যাবতীয় তথ্য তাদের নিকট সংরক্ষিত থাকে। এই মাধ্যমগুলো ব্যবহারের অনেক সুবিধার মাঝে তিনটি অসুবিধাও আছে। যথা–এক. অতিরিক্ত ফি দিতে হয়। দুই. লেনদেন সম্পন্ন হতে অতিরিক্ত সময়ক্ষেপণ হয়। তিন. তৃতীয় পক্ষের নিকট সকল ডাটা চলে যায়। মূলত এই অসুবিধাগুলো দূর করতে আবিষ্কৃত হয়েছে ইন্টারনেটভিত্তিক এক বিশেষ ব্লক চেইন প্রযুক্তি। এর দুটি অংশ। যথা–

ক. Open Ledger বা উন্মুক্ত খাতা। ইন্টারনেটে ব্লক চেইন প্রযুক্তি ব্যবহার করে যখন কেউ কারো নিকট অর্থ বা অন্য কোনো তথ্য পাঠায়, তখন ব্লক চেইন নেটওয়ার্কে যারা লেজার মেইন্টেইন করে তাদের লেজারে সেই ডাটাগুলো ব্লক হয়ে যুক্ত হয়। যেমন–A-b-C-d-e-F। ধরা যাক অ ১০০ টাকা পাঠিয়েছে ই-এর নিকট। তদ্রূপ ই কিছু পাঠিয়েছে C-এর নিকট। এভাবে প্রত্যেকে তার পরেরজনের নিকট কিছু অর্থ পাঠিয়েছে। এই পাঠানো তথ্যগুলো জমা হবে তাদের নিকট, যারা লেজার মেইন্টেইন করে। এখানে বড় হাতের ইংরেজি অক্ষর হলো সেই লেজার মেইন্টেইনকারী। পরিভাষায় তাদেরকে MinersI বলা হয়। মনে রাখতে হবে, এখানে যে লেনদেনগুলো হলো, এগুলো

করার সাথে সাথে পূর্ণতায় পৌঁছে না। তথা সাথে সাথে বাস্তবেই অর্থ স্থানান্তর হয় না। বরং লেনদেনটি করা মাত্রই একটি ব্লক তৈরি হয়। উক্ত ব্লকে প্রতি দশ মিনিটের মধ্যে যেসব ট্রাঞ্জাকশন হয়, তা রেকর্ড হয়ে যায়।

খ. Distributed Ledger। উক্ত ব্লক তৈরি হওয়ার পর সেটা ব্লক চেইন নেটওয়ার্কে ছড়িয়ে যায় এবং পৃথিবীজুড়ে হাজারো কপি তৈরি হয়। তখন সেটা উপরোক্ত প্রত্যেক মাইনারের লেজারে ব্লক হিসেবে এসে যায়। কিন্তু এতেই উক্ত ট্রাঞ্জাকশন Validate হয়নি। অর্থাৎ বাস্তবেই অর্থ স্থানান্তর হয়নি। এখন তাকে Validate করার জন্য সকল মাইনার একযোগে ওই ব্লক নিয়ে কাজ শুরু করে। তাকে সল্‌ভ করতে চেষ্টা করে। তাদের কেউ যখন সেটা সল্‌ভ করে ফেলে তখন ট্রাঞ্জাকশনটি Validate হয়। অর্থাৎ তখন বাস্তবেই যার কাছে টাকা পাঠানো হলো সে সেটা পেয়ে যায়। এই সমাধিত ব্লকটি একটি ফাইনাল ব্লক।

এবার এই ব্লকটি প্রত্যেক মাইনারের নিকট রেকর্ডকৃত পূর্বের সমাধিত ব্লকের সাথে জুড়ে যায়। অনেকটা চেইনের মতো। একটির পেছনে আরেকটি জুড়ে। এ জন্য একে ব্লক চেইন বলা হয়। উল্লেখ্য, প্রতিটি সমাধিত ব্লকে তিনটি বিষয় থাকে। যথা–ডাটা, হ্যাশ ও পূর্বের ব্লকের হ্যাশ। হ্যাশ হলো, বিশেষ অ্যালগরিদম বা বিশেষ ম্যাথ জাতীয় বিষয়। সেই ম্যাথ সলিউশন করা হলে তাকে হ্যাশ বলে। এই হ্যাশটা পূর্বের সমাধিত ব্লকের সাথে মিলতে হবে। তবেই ফাইনাললি ব্লকটি সমাধিত হবে। সর্বপ্রথম যে মাইনর সমাধান করতে পারবে সে বিট কয়েন লাভ করবে। এসব কাজের মধ্য দিয়েই তার জন্য অটো বিট কয়েন ক্রিয়েট হয়ে যাবে। বর্তমানে প্রায় প্রতি দশ মিনিটে একটি ব্লক সল্‌ভ হয়ে যায়। এসব মাইনিংয়ের জন্য বেশ পাওয়ারফুল কম্পিউটার ও বিশেষ মেশিনের প্রয়োজন হয়। অনেক বিদ্যুৎ খরচ হয়। মোটা অংকের টাকা এসব খাতে ইনভেস্ট করতে হয়।

(See Video: https:// www.youtube.com/ watch? v=kzWRBrCQE6w&t=130s)

বিট কয়েন ও একটি উদাহরণ :

আমাদের দেশে বিভিন্ন শপিং মলে এরূপ প্রচলন আছে, কোনো পণ্য ক্রয় করা হলে একটি পয়েন্ট দেওয়া হয়। এটি একটি সংখ্যা। ভার্চুয়াল টোকেন। এই পয়েন্ট যখন একটি নির্ধারিত পরিমাণে পৌঁছে, তখন তা দিয়ে ওই দোকান থেকে কোনো কিছু ক্রয় করা যায়। এর অর্থ এই ভার্চুয়াল পয়েন্টকে একটি বিনিময়ের মাধ্যমের মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। বিট কয়েন কনসেপ্ট অনেকটাই এরূপ। একটি সংখ্যা। যা মাইনিং করার পর মাইনর পেয়ে থাকে। মাইনিংয়ে উদ্বুদ্ধ করার জন্য এই ভার্চুয়াল টোকেনকে বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে একটি বিশেষ মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। যার মূল্য ডিমান্ড অনুযায়ী বাড়ে-কমে।

ব্লক চেইনের বিস্তৃতি : ব্লক চেইন প্রযুক্তি মূলত সর্বোচ্চ নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য তৈরি হয়েছে। যেমনটি আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি। তাই এ প্রযুক্তি শুধু বিট কয়েন উৎপন্নে ব্যবহৃত হচ্ছে, বিষয়টা এমন নয়। জমির দলিল সংরক্ষণের জন্যও এর ব্যবহার চিন্তা করা হচ্ছে। এমনকি এর মাধ্যমে যাকাত সংগ্রহ ও আদায়ের চিন্তাও চলমান।

নিরাপত্তা : উক্ত প্রযুক্তিতে সকল ডাটা অগণিত মাইনিংকারীর লেজারে সংরক্ষিত থাকে। ফলে সেটা হ্যাক করতে হলে একই সময় অগণিত কম্পিউটার হ্যাক করতে হবে, যা প্রায় অসম্ভব। এ জন্য বলা হয়, এটি সেন্ট্রালাইজড মাধ্যম থেকেও নিরাপদ। তবে হ্যাক হওয়াটা অবাস্তব নয়। ইতিমধ্যে কয়েকবার বিভিন্ন বিট কয়েন এক্সচেঞ্জ বা ওয়ালেট হ্যাক হয়েছে, ফলে হাজারো বিট কয়েন মজুদকারী ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে। অন্যদিকে পুরো পৃথিবীর মাইনারদের নিয়ন্ত্রণ করছে কয়েকটি বড় মাইনিং প্রতিষ্ঠান, যারা ৫০%-এর বেশি মাইনিং করে থাকে। অনেকে তাদের বিট কয়েনের সেন্ট্রাল ব্যাংক বলে অভিহিত করে থাকে। বিশেষজ্ঞদের মতে, তারা একত্র হয়ে কোনো সিদ্ধান্ত নিতে চাইলে তা অসম্ভব নয়। বলাবাহুল্য, বিট কয়েন একটি ভার্চুয়াল মুদ্রা, যা সংরক্ষিত থাকে ভার্চুয়াল ওয়ালেটে। কাজেই ওয়ালেটের নিরাপত্তা সংরক্ষণের ওপরও ব্যক্তির সংগৃহীত বিট কয়েনের নিরাপত্তা নির্ভর করে।

বিট কয়েন মাইনিং : Mining শব্দের মূল অর্থ : মাটি খুঁড়ে মূল্যবান সম্পদ বের করা বা আবিষ্কার করা। এখানে বিশেষ অ্যালগরিদম সল্‌ভ করার মাধ্যমে মূল্যবান বিট কয়েন লাভ হয়। তাই একে মাটি খুঁড়ে মূল্যবান সম্পদ বের করার সাথে তুলনা করে 'মাইনিং' বলা হয়েছে। যারা এই কাজটি করে, তাদের বলা হয় 'মাইনর' (Miner)। বিট কয়েন মাইনিংয়ের প্রধান উদ্দেশ্য হলো, দুজন লেনদেনকারীর মালিকানা যথাযথভাবে ট্রান্সফার করাকে নিশ্চিত করা। এই নিশ্চিতকরণটা পূর্বোক্ত পন্থায় যে আগে করতে পারবে সেই কিছু বিট কয়েন লাভ করবে। এভাবে ২১ মিলিয়ন বিট কয়েন একক তৈরি করা যাবে।

এভাবেই উক্ত প্রযুক্তির প্রোগ্রাম সেট করা আছে। এরপর আর নতুন করে বিট কয়েনের কোনো একক তৈরি করা সম্ভব হবে না। (অর্থাৎ তখন আক্ষরিক অর্থেই মাইনিং বন্ধ হয়ে যাবে)। তবে উক্ত প্রযুক্তি ব্যবহার করে অর্থ লেনদেনের সত্যায়নের কাজ মাইনিংকারীরা করে যাবে আগের মতোই। তখন বিট কয়েনের বহু ক্ষুদ্র এককে কাজে লাগানো হবে। বিশেষজ্ঞরা তা-ই বলছেন।

বিট কয়েন সংগ্রহ : বিট কয়েন মূলত দুটি পন্থায় সংগ্রহ করা হয়। যথা–এক. মাইনিং করে। এর বিবরণ পূর্বে দেওয়া হয়েছে। দুই. ক্রয় করে। যার কাছে বিট কয়েন আছে সেটা কাগুজে মুদ্রায় ক্রয় করা। বিট কয়েন সংগ্রহের জন্য দ্বিতীয়টিই এখন পর্যন্ত বহুল ব্যবহৃত মাধ্যম। একেই বলা হয় 'বিট কয়েন ইনভেস্ট'। বলাবাহুল্য, বিট কয়েন সংগ্রহের দুটি মাধ্যমই বেশ প্রতারণাপূর্ণ। বহু মানুষের টাকা খোয়া গেছে।

বিট কয়েন সংরক্ষণ : ইলেকট্রনিক বিশেষ পন্থা তথা E-Wallet -এর মাধ্যমে বিট কয়েন সংরক্ষণ করা হয়। এর মাধ্যমে বিট কয়েন বেচাকেনাও করা হয়। কয়েকটি প্রসিদ্ধ ই-ওয়ালেট হলো :

১. Computer Wallets : এর মাধ্যমে বিট কয়েন প্রেরণ করা, গ্রহণ করা সবই সম্ভব। ২. Phone Wallets : এটি অনেকাংশেই প্রথমটির মতো। এর মাধ্যমে NFC (Near field communication) টেকনোলজি ব্যবহার করে ক্রয়কৃত বিভিন্ন পণ্যের দামও শোধ করা যায়। ৩. Web wallets : বিট কয়েন ব্যবহারকারী এর মাধ্যমে নির্ধারিত সাইটে প্রথমে রেজিস্ট্রেশন করতে হয়। এটি অনেকটা ই-মেইল খোলার মতো। এরপর নির্ধারিত অ্যাকাউন্ট খুলে তাতে বিট কয়েন সংরক্ষণ করা হয়। ৪. Hardware wallets : এটি ছোট একটি মেশিন জাতীয়। যার কাজই হলো বিট কয়েন সংরক্ষণ করা। অন্য কোনো কাজ নয়। এতে অন্য কোনো প্রোগ্রাম আপলোড করা যায় না। ইলেকট্রনিক চুরির ক্ষেত্রে এটি পূর্বের সকল পন্থার চেয়ে অনেক বেশি নিরাপত্তা দান করে।

বিট কয়েন ও অবৈধ কার্যকলাপ : বিট কয়েন সেন্ট্রালাইজড না হওয়ায় এর মাধ্যমে রাষ্ট্রবিরোধী কার্যকলাপ অনেক সহজ। ব্লক চেইন প্রযুক্তিটি প্রতিটি তথ্য অজ্ঞাতনামে সংরক্ষণ করে, ফলে বিট কয়েনের প্রেরক ও প্রাপক কে তা নির্দিষ্ট করা যায় না। সুতরাং অর্থপাচার (Money laundering), ট্যাক্স/কর ফাঁকি দেওয়া, ফটকাবাজি (Speculations), শুল্ক ফাঁকি দিয়ে আমদানি-রপ্তানি (Smuggling), অস্ত্রের ব্যবসা ইত্যাদি যাবতীয় রাষ্ট্রীয় আইনবহির্ভূত ও শরীয়াহ্ পরিপন্থী কার্যকলাপ অনায়াসেই করা যায়। ইসলামিক ইকোনমিক ফোরাম তাদের বিট কয়েনবিষয়ক গবেষণায় লিখেছে, অস্ট্রেলিয়ার জনৈক গবেষক তাঁর গবেষণায় দেখিয়েছেন যে এর মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় আইনবহির্ভূত কার্যকলাপ (অস্ত্রের ব্যবসা ইত্যাদি) এর হার ৫০%।

শরঈ পর্যালোচনা : ইতিমধ্যে আন্তর্জাতিক মানের কয়েকটি ইসলামিক প্রতিষ্ঠান থেকে বিট কয়েন বিষয়ে শরঈ পর্যালোচনা পেশ করা হয়েছে। তন্মধ্যে অন্যতম হলো, তুরস্কের ধর্মবিষয়ক মন্ত্রণালয়, মিসরের কেন্দ্রীয় ফতওয়া বিভাগ, ফিলিস্তিনের কেন্দ্রীয় ফতওয়া বিভাগ, আন্তর্জাতিক ইসলামী বিদ্যাপীঠ দারুল উলূম দেওবন্দের ফতওয়া বিভাগ, জামিয়া দারুল উলূম করাচি, জামিয়াতুর রশীদ করাচি ও ইসলামিক ইকোনমিক ফোরাম নামক শরীয়াহ স্কলারদের একটি অনলাইন গ্রুপ। শেষোক্ত ফোরাম এ বিষয়ে ফকীহদের নিয়ে মতবিনিময় মজলিস অনুষ্ঠিত করেছে। এরপর ফোরামের পক্ষ থেকে বিট কয়েন বিষয়ে যৌথ শরঈ পর্যালোচনা পেশ করা হয়েছে। ৩১ পৃ. ব্যাপী তাঁদের গবেষণামূলক যৌথ শরঈ পর্যালোচনাটি আরবী ভাষায় গত ১১/১/২০১৮ ইং তারিখে 'ইন্টারন্যাশনাল শরীয়াহ্ রিসার্চ একাডেমি ফর ইসলামিক ফিন্যান্স (ISRA)' মালয়েশিয়ার অফিশিয়াল ওয়েবসাইটে (https://www.isra.my/) ও অনলাইনভিত্তিক 'ইসলামিক ইকোনমিকস অ্যান্ড ফিন্যান্স পিডিয়া'-এর ওয়েবসাইটে (http://iefpedia.com/arab/?p=40129) প্রকাশ হয়েছে। উক্ত গবেষণাটি ইসলামী অর্থনীতি জগতে এ বিষয়ে বিশদ প্রথম সম্মিলিত শরঈ আলোচনা।

বর্তমান পর্যন্ত বিট কয়েন বিষয়ে শরঈ যে মতামতগুলো প্রকাশিত হয়েছে, এগুলো মোট তিন ধরনের। যথা–

ক. বিট কয়েনের ব্যবহার বৈধ নয়। (যথাক্রমে মিসরের কেন্দ্রীয় ফতওয়া বিভাগ, দেওবন্দের ফতওয়া ও তুরস্কের ধর্ম মন্ত্রণালয়) কেউ হারামও বলেছেন (ফিলিস্তিনের কেন্দ্রীয় ফতওয়া বিভাগ)

খ. বিট কয়েনের ব্যবহার শর্তসাপেক্ষে মৌলিকভাবে বৈধ। (জামিয়াতুর রশীদ

করাচি)

গ. এর থেকে বেঁচে থাকাই সতর্কতা। (জামিয়া দারুল উলূম করাচি)

উপরোক্ত শরঈ পর্যালোচনায় বিট কয়েনের যে প্রসঙ্গগুলো গুরুত্বের সাথে আলোচনায় এসেছে, সংক্ষেপে তা হলো ১. বিট কয়েন প্রকাশকের অজ্ঞতা। ২. এর ভবিষ্যৎ বিষয়ে অজ্ঞতা। ৩. এর প্রাতিষ্ঠানিক কোনো প্রকাশক নেই। জিম্মাদারও নেই। ৪. রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে তত্ত্বাবধান ও পর্যবেক্ষণ নেই। ৫. এতে ব্যাপকভাবে স্প্যাকুলেশন হয়। এর মূল্য স্থির থাকে না। ৬. আইনবহির্ভূত কাজে অধিক ব্যবহার হওয়া। ৭. উপরোক্ত বৈশিষ্ট্যের কারণে এটি শরীয়তের দৃষ্টিতে মূল্যমানবিশিষ্ট (মালে মুতাকাওয়্যিম) হবে কি না। যারা একে নাজায়েয বলেন, তাঁদের মতে বিট কয়েনে উপরোক্ত ১-৬টি বৈশিষ্ট্য থাকায় সেটি শরীয়তের দৃষ্টিতে মূল্যমানবিশিষ্ট (মালে মুতাকাওয়্যিম) কিছু নয়। তাই এটির ব্যবহার জায়েয নয়। বর্তমান পর্যন্ত এ মতের প্রবক্তার সংখ্যাই অধিক। এটিকে এভাবেও বলা যেতে পারে, বর্তমান বিশ্বের অধিকাংশ ফকীহর মতে বিট কয়েনের লেনদেন শরীয়ত মতে বৈধ নয়।

আরো সংক্ষেপে বললে, তাঁদের আলোচনায় বিট কয়েন শরঈভাবে নিষিদ্ধ হওয়ার মৌলিক কারণ তিনটি। যথা–১. গারার (Uncertainty), জাহালাহ (অজ্ঞতা) ও গ্যামব্লিং। মূলত বিট কয়েনের প্রকাশকের অজ্ঞতা, এর ভবিষ্যৎ বিষয়ে অজ্ঞতা, এটি সেন্ট্রালাইজড না হওয়া, তত্ত্বাবধান ও পর্যবেক্ষণ না হওয়া থেকেই এসব গারার ও জাহালার সৃষ্টি। ২. নিষিদ্ধ কাজের মাধ্যম হওয়া। ৩. উপরোক্ত বৈশিষ্ট্যসমূহের কারণে শরীয়তের দৃষ্টিতে এটি মূল্যমানবিশিষ্ট সম্পদ না হওয়া।

বিট কয়েনের লেনদেন অবৈধ হওয়ার আরেকটি বড় কারণ হলো রাষ্ট্রীয়ভাবে নিষিদ্ধ হওয়া। কেননা শরীয়তের সাথে সাংঘর্ষিক নয়, এমন সকল আইন মেনে চলা শরীয়তের দৃষ্টিতে ওয়াজিব। যেহেতু বাংলাদেশ ব্যাংক ইতিমধ্যে বিট কয়েনের লেনদেনকে অবৈধ বলে ঘোষণা দিয়েছে, যা সকল জাতীয় দৈনিকে প্রকাশিতও হয়েছে তাই বাংলাদেশে বিট কয়েনের লেনদেন শরীয়ত মতে বৈধ হওয়ার কোনো সুযোগই থাকে না।

এর দ্বারা যাকাত আদায়েরও কোনো সুযোগ নেই। কেননা অবৈধ মাল দ্বারা যাকাত আদায় করা শরীয়তের দৃষ্টিতে জায়েয নেই।

মুহিউস সুন্নাহ হযরত মাওলানা শাহ আবরারুল হক্ব হক্কী হারদূয়ী (রহ.)-এর অমূল্য বাণী

মাদরাসার জিনিস নষ্ট না করা :
এক স্থানে এতক্ষণ বসে ছিলেন, ওঠার সময় দেখবেন পাখা চালু কি না। বাতি জ্বলছে না তো! যদি পাখা চলে বা বাতি জ্বলে বন্ধ করে দেন। অন্যথায় মাদরাসার টাকা নষ্ট হবে। মাদরাসার কিছুই নষ্ট করা যাবে না। মাদরাসার মাধ্যমে উম্মতের এবং আমাদের কত উপকার হচ্ছে। মাদরাসার কোনো জিনিসের যেন ক্ষতি না হয়। মাদরাসার যাবতীয় বিষয় রক্ষার জন্য আমাদের খুব খেয়াল রাখতে হবে।

হযরত হাকীমুল উম্মত (রহ.)-এর বাণী
এক ব্যক্তি সব সময় হযরত হাকীমুল উম্মত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রহ.)-এর কিতাবাদি পড়েন। তাঁর বাণী ও ওয়াজ-নসীহতগুলো পড়তে পড়তে সব সময় ওই ব্যক্তির কান্না আসত। একদা নামাযেই উক্ত কান্না এসে গেল। তিনি তা নিবারণ করে নিলেন। হযরত হাকীমুল উম্মত (রহ.) বিষয়টি জানার পর তাঁকে বললেন, কান্না নিবারণ না করা উচিত ছিল। কান্নার কারণে মানসিক প্রশান্তি অর্জিত হয়। কান্না এলেই কান্না করবেন। কান্নাকাটি আল্লাহ তা'আলা খুবই পছন্দ করেন।

উন্নতি না হওয়ায় ভীত হইও না :
কোনো তালেবে ইলম পড়ালেখায় উন্নতি করতে না পেরে অন্যদের পেছনে পড়ে গেলে ভীত হওয়ার কিছু নেই। ঘড়ির যখন ব্যাটারির চার্জ কমে যায় তখন সাময়িক গতি কমে যায়। নতুন ব্যাটারি লাগিয়ে সময় ঠিক করে দিলে আগের মতোই গতি সঞ্চার হয়। কিন্তু ঘড়ি নিজে নিজে ঠিক হয় না। বরং অন্যের সাহায্যে ঠিক করা হয়। তেমনি তালেবে ইলম যদি পুনরায় নিজেকে সংযত করে উস্তাদের তারবিয়াত, বকুনি ইত্যাদি বরদাশত করে পড়ালেখায় মনোনিবেশ করে তবে বরকত হয়, উন্নতির ধারায় পুনরায় ফিরে আসে। এভাবে প্রত্যেকের কমতিগুলো পূরণ হয়ে যায়। يا عليم দৈনিক ১৫০ বার পড়তে থাকো। এর মাধ্যমে স্মরণশক্তি বৃদ্ধি পাবে।

অন্য শায়খের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করেন :
এক লোক কোনো ডাক্তারের চিকিৎসা গ্রহণ করে থাকে। হঠাৎ উক্ত ডাক্তারের মৃত্যু হয়ে গেল। তখন ওই রোগী ব্যক্তি কোনো বিলম্ব না করে অন্য ডাক্তারের কাছে যায়। শারীরিক রোগের ক্ষেত্রে যেমন অন্য ডাক্তারের কাছে যাওয়া হয়, আধ্যাত্মিক রোগীকেও অন্য শায়খের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করতে হবে। যদি নিজের শায়খ দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়ে যান তবে বিলম্ব না করেই অন্য শায়খের সাথে সম্পর্ক স্থাপন জরুরি। এ ক্ষেত্রে অলসতা দেখা যায়। যা উচিত নয়। শারীরিক রোগ থেকে রূহানী তথা আধ্যাত্মিক রোগের প্রকোপ ও ক্ষতির মাত্রা আরো বেশি। তাই এর চিকিৎসা ও সংশোধনের ফিকির আরো বেশি করা উচিত।

আমলী মশক তথা বাস্তব অনুশীলনের মাধ্যমেই সংশোধন বেশি হয় :
এক লোকের মাধ্যমে ফজরের নামায পড়ানো হলো। তিনি পাঁচ নিঃশ্বাসে সূরায়ে ফাতেহা পড়ে ফেললেন। এই ব্যাপারে হযরত বলেন, শোনার কারণে কাজে দৃঢ়তা আসে না। যতক্ষণ পর্যন্ত আমলী মশক তথা বাস্তব অনুশীলন না করা হয়। দীর্ঘদিন থেকেই শুনে আসছেন যে নামাযে সূরায়ে ফাতেহা পড়ার সময় প্রত্যেক আয়াতেই নিঃশ্বাস শেষ করা উচিত। কিন্তু এগুলো শুধু শোনা পর্যন্ত সীমাবদ্ধ থাকায় কাজ হয়নি। তাই প্রথমে শিখতে হবে, অতঃপর তা বাস্তব অনুশীলন করতে হবে। তখন দৃঢ়তা আসবে।

প্রতিটি কাজ ধ্যান সহকারে করা উচিত :
যেকোনো কাজ করার সময় পূর্ণ মনোযোগ দিতে হবে। মনোযোগ দেওয়া ছাড়া কাজ করলে অনেক সময় কাজ তো হয়ে যায়; কিন্তু উন্নত হয় না। মনোযোগ হলো বাহ্যিক অঙ্গপ্রত্যঙ্গ যে কাজ করছে তার প্রতি অন্তরকে সজাগ রাখা। যেমন নামায আদায় করছেন। তাতে হাত-পায়ে-মুখে যে আমলই করা হচ্ছে তার প্রতিটিতে পূর্ণ মনোযোগ থাকা। যখন আল্লাহু আকবর বলা হলো, তখন শব্দটি মুখ থেকে বের হওয়ার সময় মনকে সেদিকেই সজাগ রাখা, কান দ্বারা মনোযোগের সহিত শব্দটি শোনা। এভাবে ক্রমান্বয়ে একটি বিশেষ শক্তি অর্জিত হয়। যার মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলার আদেশ ও চাহিদার ওপর কাজ করার তাওফীক অর্জিত হয়। এই শক্তি ও বস্তুটি অর্জনের জন্যই মূলত আল্লাহওয়ালাদের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করতে হয়। তাঁদের সাহচার্য এবং বরকতে এই বিষয়গুলো হাসিল হয়ে যায়।

ইফাদাতে

হযরত ফকীহুল মিল্লাত (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি)

বিভিন্ন সময় ছাত্র-শিক্ষক ও সালেকীনদের উদ্দেশে দেওয়া তাকরীর থেকে সংগৃহীত

শবে বরাতের ফজীলত ও করণীয়

ইসলামী ক্যালেন্ডার অনুযায়ী শা'বান অষ্টম মাস। এ মাসের কিছু ফজীলত এবং করণীয় ও বর্জনীয় কাজের বিবরণ তুলে ধরা হলো।

শা'বান রাসূল (সা.)-এর মাস :

এক হাদীসে বর্ণিত রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন,

شهر رمضان شهر الله، وشهر شعبان شهرى، وشعبان المطهر ورمضان المكفر

অর্থাৎ রমাজান আল্লাহর মাস আর শা'বান আমার মাস। শা'বান মানুষকে পবিত্র করে আর রমাজান মানুষের গোনাহ মার্জনা করে। (ইবনে আসাকির ৭২/১৫৫)

শা'বানের দু'আ :

হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, যখন রজব মাস শুরু হতো তখন রাসূল (সা.) এই দু'আ পাঠ করতেন,

اللهم بارك لنا فى رجب وشعبان وبلغنا رمضان

হে আল্লাহ! রজব ও শা'বানে আমাদের বরকত দাও এবং রমাজান পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দাও। (আহমদ, ২২২৮)

রোজার গুরুত্ব :

শা'বানের একটি ফজীলত হলো, রাসূল (সা.) রমাজান ছাড়া রোজার প্রতি সর্বাধিক গুরুত্ব এ মাসে দিতেন। হযরত আয়েশা (রা.) বলেন,

لم يكن النبى ﷺ يصوم شهرا اكثر من شعبان فانه كان يصوم شعبان كله

রাসূল (সা.) প্রায় শা'বানজুড়েই রোজা রাখতেন। (বোখারী হা. ১৯৭০) হযরত উসামা বিন যায়েদ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

قلت لم ارك تصوم شهرا من الشهور ماتصوم من شعبان قال ذاك شهر يغفل الناس بين رجب ورمضان وهو شهر ترفع فيه الاعمال الى رب العالمين واحب ان يرفع عملى وانا صائم۔

আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি শা'বানে যে পরিমাণ রোজা রাখেন অন্য কোনো মাসে আপনাকে এত বেশি রোজা রাখতে দেখি না। (কারণ কী?) রাসূল (সা.) বলেন, এটা এমন একটি মাস, যে মাসের ফজীলত সম্পর্কে মানুষ বেখবর। এ মাসে মানুষের আমল রাব্বুল আলামীনের কাছে পেশ করা হয়। তাই আমি রোজা অবস্থায় আমার আমল পেশ হোক–এটা পছন্দ করি। (নাসাঈ ৪/২০১)

এক হাদীসে আছে, হযরত আয়েশা (রা.) রাসূল (সা.)-এর কাছে জানতে চান, কী কারণে আপনি শা'বানে রোজা রাখা অধিক পছন্দ করেন? উত্তরে রাসূল (সা.) বলেন,

ان الله يكتب فيه على كل نفس ميتة تلك السنة فاحب ان يأتينى اجلى وا نا صائم

আগামী বছর মৃত্যুবরণকারীদের নাম এ মাসেই লেখা হয়। তাই আমার মনোবাসনা হলো আমার মৃত্যুর ফয়সালা রোজাবস্থায় হোক। (আত্তারগীব, হা. ১৫৪০)

শবে বরাত :

১৫ তারিখের রাতের কারণে ও এই মাসটি বিশেষভাবে ফজীলতপূর্ণ। এই রাতটিকে কোরআনে ليلة مباركة (লাইলাতুম মুবারাক) এবং রাসূল (সা.)-এর ভাষায় ليلة البراء (লাইলাতুল বারাআহ) বলা হয়েছে। আর আমাদের মাঝে এ রাতটি শবে বরাত নামে পরিচিত। এর অর্থ হলো, নাজাত পাওয়ার রাত। এই রাতে যেহেতু অসংখ্য গোনাহগারের মাগফিরাত লাভ হয় তাই এই রাতকে শবে বরাত বলা হয়। হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত রাসূল (সা.) এক রাতে আমাকে জিজ্ঞাসা করেন,

اتدرينای ليلة هذه ؟ قلت الله ورسوله اعلم ، قال هذه ليلة النصف من شعبان ان الله عز وجل يطلع على عباده فى ليلة النصف من شعبان، فيغفر للمستغفرين ويرحم المسترحمين ويؤخر اهل الحقد كما هم۔

তুমি কি জানো এটি কোন রাত? আমি আরজ করলাম, আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল ভালো জানেন! রাসূল (সা.) বলেন, এটা শা'বানের ১৫তম রাত। এ রাতে আল্লাহ তা'আলা বান্দাদের প্রতি রহমতের নজর দেন। মাগফিরাত প্রার্থনাকারীদের মাগফিরাত করেন। রহমত প্রার্থীদের রহমত করেন। কোনো মুসলমানের প্রতি অন্তরে বিদ্বেষ পোষণকারীকে তার হালতে ছেড়ে দেন। (শু'আবুল ঈমান

হা. ৩৫৫৪)

রাত জেগে ইবাদত :

হযরত মুআয (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন,

من احيا الليالى الخمس وجبت له الجنة، ليلة التروية وليلة عرفة، وليلة النحر وليلة الفطر ، وليلة النصف من شعبان ـــ رواه الاصبهانى

যে ব্যক্তি পাঁচটি রাতে জাগ্রত থেকে ইবাদত করবে তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে যাবে। এই পাঁচটি রাত হলো জিলহজের ৮ তারিখের রাত, আরফার রাত, দুই ঈদের রাত এবং শবে বরাত। (আত্তারগীব হা. ১৬৪৩)

দু'আ কবুল হওয়ার রাত :

হযরত আব্দুল্লাহ বিন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন,

خمس ليال لا يرد فيهن الدعاء، ليلة الجمعة واول ليلة من رجب وليلة النصف من شعبان وليلة العيد وليلة النحر

পাঁচটি রাত এমন আছে, যে রাতে কোনো দু'আ প্রত্যাখ্যাত হয় না, অর্থাৎ অবশ্যই কবুল হয়। তন্মধ্যে একটি রাত হলো শবে বরাত। (শু'আবুল ঈমান, হা. ৩৪৪০)

শবে বরাতের দু'আ :

হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, শা'বানের ১৫ তারিখের রাতে নফল নামাযের সিজদায় রাসূল (সা.)-কে এ দু'আ পড়তে শুনেছি,

اعوذ بعفوك من عقابك اعوذ برضاك من سخطك اعوذ بك منك جل وجهك لا احصى ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك۔

অতঃপর যখন ফজর হলো আমি রাসূল (সা.)-এর সামনে এই দু'আর উল্লেখ করি। তখন রাসূল (সা.) বলেন, আয়েশা! এ দু'আ নিজে শেখো এবং অন্যকে শেখাও। কারণ এ দু'আটি হযরত জিব্রাঈল (আ.) আমাকে শিখিয়ে বলেছেন, যেন এই দু'আটি সিজদায় বারবার পড়ি। (শু'আবুল ঈমান হা. ৩৫৫৬)

জাহান্নাম থেকে মুক্তির রাত :

আল্লাহ তা'আলা এ রাতে অসংখ্য জাহান্নামীকে জাহান্নাম থেকে মুক্তিদান করেন। হাদীসে বর্ণিত রাসূল (সা.) বলেন,

اتانى جبرئيل عليه السلام فقال: هذه ليلة النصف من شعبان ولله فيها عتقاء من النار بعدد شعور غنم كلب۔

হযরত জিব্রাঈল (আ.) আমাকে বলেছেন, এটা শবে বরাত, এ রাতে আল্লাহ তা'আলা কালব গোত্রের ভেড়ার পশমের চেয়েও বেশিসংখ্যক জাহান্নামীকে জাহান্নাম থকে মুক্তিদান করেন। (আত্তারগীব হা. ১৫৪৫)

শবে বরাতের বরকত থেকে যারা বঞ্চিত :

শবে বরাত বরকতময় হওয়ার বিষয়টি সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত। কিন্তু কিছু বদ নসীব হতভাগা ও নির্বোধ এ রাতের বরকত থেকে বঞ্চিত থাকে। হাদীসের আলোকে তারা হলো শিরককারী, ব্যভিচারী, কাউকে অন্যায়ভাবে হত্যাকারী, আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী, টাখনুর নিচে কাপড় পরিধানকারী পুরুষ, মা-বাবার অবাধ্য সন্তান এবং নেশায় অভ্যস্ত ব্যক্তি।

কিছু বিশেষ আমল :

শবে বরাতে বিশেষ কিছু আমলের প্রতি গুরুত্বারোপ করা বাঞ্ছনীয়। যেমন–সময়মতো এশা এবং ফজরের নামায আদায় করা, সামর্থ্য অনুযায়ী নফল নামায পড়া, বিশেষ করে তাহাজ্জুদ আদায় করা, সম্ভব হলে সালাতুস তাসবীহ আদায় করা, কোরআন কারীম তেলাওয়াত করা, দরূদ শরীফের প্রতি বেশি গুরুত্ব দেওয়া, বেশি বেশি যিকির করা, দু'আর প্রতি মনোযোগী হওয়া এবং মাগফিরাত কামনা করা।

শবে বরাতে সংঘটিত বিদ'আত ও কুসংস্কার :

আফসোস, বর্তমানে এই পবিত্র রজনীতে এমন কিছু কুসংস্কার ও বিদ'আতের আয়োজন করা হয়, যার সাথে ইসলামের ন্যূনতম সম্পর্ক নেই। যেমন–ঘরে ঘরে হালুয়া-রুটি তৈরি করা, আতশবাজি, সম্মিলিতভাবে কবরস্থানে যাওয়া, নারীদের কবরস্থানে গমন এবং কবরস্থান, মসজিদ, ঘরবাড়ি ও রাস্তাঘাটে মরিচাবাতি দ্বারা আলোকসজ্জার ব্যবস্থা করা, বিভিন্ন স্থাপনায় ডেকোরেশন করা, নর-নারীদের অবাধে মেলামেশা, কবরে সালু দেওয়া, ডাকঢোল পিটিয়ে চাঁদা করে খিচুড়ি-বিরিয়ানি রান্না করে খানার আয়োজন করা ইত্যাদি। রহমত নাযিল হওয়ার এ পবিত্র রাতে এসব কুসংস্কার ও বিদ'আত ছেড়ে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের সকলকে তাওফীক দান করুন। আমীন।

(রিপ্রিন্ট)

বিন্যাস ও গ্রন্থনা :
মুফতী নূর মুহাম্মদ

'সিরাতে মুস্তাকীম' বা সরল পথ

উলামায়ে হকের পরিচয়

শায়খুল হাদীস আল্লামা মুফতী মনসূরুল হক্ব

[৬ জানুয়ারি, ২০১৮ খ্রিস্টাব্দে মুহাম্মদপুরের বসিলা গার্ডেন সিটিতে অবস্থিত উচ্চতর ইসলামী শিক্ষা ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান মা'হাদুল বুহুসিল ইসলামিয়ার সালানা জলসায় প্রদত্ত বয়ান।]

হামদ ও সালাতের পর...

মাদরাসার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা :

অনেকে বলে, মাদরাসার সংখ্যা বেশি হয়ে যাচ্ছে। কথাটা সঠিক নয়। প্রতিটি মহল্লায় একটি দ্বীনি মাদরাসা থাকা ফরযে কিফায়া। বাংলাদেশের প্রতিটি গ্রামে প্রাইমারি স্কুল আছে; কিন্তু প্রতিটি গ্রামে দ্বীনি মাদরাসা নেই। সে হিসেবে এখনো লাখ লাখ মাদরাসা প্রতিষ্ঠা হওয়া দরকার।

আমরা আল্লাহ তা'আলার গোলাম, আল্লাহ তা'আলা আমাদের মালিক। মালিকের গোলামি কিভাবে করতে হয়, মালিক আমাদের কী কাজের জন্য সৃষ্টি করেছেন, কী কী দায়িত্ব দিয়েছেন– এগুলো পরিপূর্ণভাবে একমাত্র মাদরাসার মাধ্যমেই অবগত হওয়া সম্ভব।

হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রহ.) বেহেশতী যেওরে লিখেছেন, ফরযে আইন পরিমাণ ইলম শিক্ষা করা যায়–এ ধরনের মাদরাসা প্রতিটি মহল্লায় থাকা ফরযে কিফায়া। অন্যথায় মহল্লার সকলেই গোনাহগার হবে।

কওমী মাদরাসাগুলো এই গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করছে। দ্বীনি প্রয়োজন পূরণ হওয়ার পাশাপাশি এসব মাদরাসা দ্বারা দুনিয়াবী অনেক প্রয়োজনও পূরণ হচ্ছে। এমনকি দেশের সরকারও অনেকভাবে লাভবান হচ্ছে।

প্রথমত, সরকারের একটি উদ্যোগ হলো নিরক্ষরতা দূরীকরণ। কওমী মাদরাসা দ্বারা লাখ লাখ ছেলে শিক্ষিত হচ্ছে। এর ফলে সরকারের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য হাসিল হয়ে যাচ্ছে।

দ্বিতীয়ত, কওমী মাদরাসাগুলোতে ধনী ছেলেদের পাশাপাশি অনেক গরিব ছেলেও লেখাপড়া করে। মাদরাসা কর্তৃপক্ষ তাদের থাকা-খাওয়ার সুব্যবস্থা করে বড় বড় আলেম বানিয়ে দিচ্ছে, আলহামদুলিল্লাহ। এরা নিজেরা প্রকৃত মানুষ হয়ে অন্যদেরও সভ্য মানুষ বানাচ্ছে। এসব ছেলে লেখাপড়া শিখে আলেম না হলে–আল্লাহ না করুন অভাবের তাড়নায় দেশের মধ্যে বহু বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করত। তাদের নিয়ন্ত্রণ করতে সরকারকে হিমশিম খেতে হতো।

তৃতীয়ত, কওমী মাদরাসার হাজার হাজার শিক্ষার্থী জাপান থেকে আমেরিকা পর্যন্ত সারা দুনিয়ায় দ্বীনের খেদমত করছে। তাদের পাঠানো ডলার-রিয়াল-ইয়েন প্রভৃতি দ্বারা সরকারের রিজার্ভ বাড়ছে। দুনিয়াবী ব্যাপারে এগুলো ছাড়াও কওমী মাদরাসার আরো বহু অবদান রয়েছে। অথচ তাদের পেছনে সরকারের এক পয়সাও খরচ করার প্রয়োজন পড়ে না।

দ্বীনি ইলম না থাকার ফল

প্রয়োজনীয় দ্বীনি ইলম না থাকলে সমাজের সর্বস্তরেই চরম অবক্ষয় নেমে আসে। জনগণ ও সরকার কেউই এ অবক্ষয় থেকে মুক্ত থাকে না। মানুষের স্বাভাবিক বিবেক-বুদ্ধিও তখন লোপ পায়।

সন্তানকে গড়ে তুলুন :

সমাজের চলমান অবক্ষয় থেকে মুক্তি পেতে হলে আমাদের করণীয় হলো, নিজ নিজ সন্তানের হক আদায় করা। সন্তানের প্রধান হক হলো, তাকে দ্বীনের সহীহ তা'লীম দেওয়া। আজীবন আল্লাহর রাস্তায় চলতে পারে, মুসলমান হিসেবে জীবন যাপন করতে পারে, মৃত্যুর সময় পিতা-মাতার পাশে বসে সূরা ইয়াসিন পড়তে পারে, কালিমার তালকীন করতে পারে, জানাযা পড়াতে পারে, কবরে ডান কাতে শোয়াতে পারে–এই পরিমাণ দ্বীনি ইলম শিক্ষা দেওয়া। তাহলে মাতা-পিতা দুনিয়াতেও শান্তি পাবেন, কবরেও শান্তি পাবেন। ওই ছেলে যত আমল করবে সমস্ত নেকী পিতা-মাতার আমলনামায় যুক্ত হবে। হাশরের ময়দানে নেকীর পাল্লা ভারী হয়ে তারা বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করবেন। সন্তান জান্নাতের যে স্তরে থাকবে পিতা-মাতাও ওই স্তরে থাকবেন।

আর যদি পিতা-মাতা সন্তানকে দ্বীনি ইলম শিক্ষা না দেয়, সন্তান ব্রিটিশ সিলেবাসে পড়ে ইংরেজদের ধ্যান-ধারণা নিয়ে বড় হয় তাহলে সে যত ধরনের গোনাহ করবে, সুদ খাবে, ঘুষ খাবে, মদপান করবে, মহিলাদের নৃত্য দেখবে, সমস্ত গোনাহ সন্তানের আমলনামায় তো থাকবেই; সমপরিমাণ গোনাহ পিতা-মাতার আমলনামায়ও যুক্ত হবে। ফলে হাশরের ময়দানে বহু পিতা-মাতাকে বিনা হিসাবে জাহান্নামে যেতে হবে। হাশরের ময়দানে সন্তান তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করবে যে, হে আল্লাহ! আমার পিতা-মাতা

তাদের দুনিয়া সাজানোর জন্য আমাকে কোরআন-সুন্নাহের শিক্ষা থেকে বঞ্চিত করেছিল; তাদেরকে দ্বিগুণ শাস্তি দিন। পিতা-মাতাকে আমার সামনে হাজির করুন, তাদের বুকের ওপর পা দিয়ে আমি দোযখে যাব। (সূরা হা-মীম সাজদা-২৯)

হক্কানী উলামায়ে কেরামের আলামত ও তাঁদের দায়িত্ব :

ইলমের গুরুত্ব বুঝে নিজে আমল করা এবং সন্তানকে ইলম শিক্ষা দেওয়ার জন্য আমাদেরকে হক্কানী উলামায়ে কেরামের শরণাপন্ন হতে হবে। নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হক্কানী আলেমের আলামত বয়ান করে হাদীসে পাকে ইরশাদ করেন :

إن العلماء ورثة الأنبياء ، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما إنماورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر

অর্থ : উলামায়ে কেরাম নবীগণের ওয়ারিশ। নবীগণ দিনার-দিরহাম, টাকা-পয়সার ওয়ারিশ বানান না; ইলমের ওয়ারিশ বানান। সুতরাং যে ব্যক্তি ইলম হাসিল করল সে বিরাট অংশ হাসিল করল। (সুনানে আবু দাউদ; হা. নং ৩৬৪১)

এই হাদীসে হক্কানী আলেমদের দুটি আলামত বয়ান করা হয়েছে–

প্রথম আলামত : উলামাগণ নবীগণের ওয়ারিশ। লক্ষ করুন, এখানে ওয়ারিশ বলা হয়েছে; নায়েব, খলীফা বা অন্য শব্দ বলা হয়নি। কারণ দুনিয়াতে কোনো ব্যক্তি থেকে মীরাস পেতে হলে তার সঙ্গে ছেলে-মেয়ে-ভাই-বোন যেকোনো ধরনের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তার সম্পর্ক থাকতে হয়। সম্পর্ক না থাকলে মৃত ব্যক্তির সম্পদ থেকে মীরাস পাওয়া যায় না। তদ্রূপ নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) পর্যন্ত সম্পর্কের অটুট বন্ধন না থাকলে নবীজির ওয়ারিশ হওয়া যায় না।

বোঝা গেল, যেকোনো ব্যক্তির বয়ান শ্রবণ করা যাবে না, তাফসীর শ্রবণ করা যাবে না, বই পড়া যাবে না। শোনার আগে নবীজি পর্যন্ত তার সম্পর্ক, অর্থাৎ সনদ আছে কি না দেখতে হবে। আমরা যেকোনো হাদীসই বয়ান করি সে হাদীসের সনদ আমাদের থেকে নিয়ে নবীজি পর্যন্ত পৌঁছাতে পারব। আলহামদুলিল্লাহ। কারণ আমাদের উস্তাদ হাদীস পড়ানোর সময় তাঁর থেকে শুরু করে কিতাব সংকলক পর্যন্ত সনদ বর্ণনা করেছেন। কিতাব সংকলক থেকে নবীজি পর্যন্ত সনদ কিতাবের মধ্যেই লিপিবদ্ধ আছে। কাজেই যেকোনো হাদীসের সনদ আমরা আমাদের থেকে নিয়ে নবীজি পর্যন্ত পৌঁছাতে পারব। আলহামদুলিল্লাহ।

হাদীসের সনদ ইসলামের সত্যতার একটি প্রমাণ। ইহুদি-খ্রিস্টানরা একটি কথাও তাদের নবী পর্যন্ত পৌঁছাতে পারবে না।

দ্বিতীয় আলামত : মৃত্যুবরণকারী ব্যক্তির রেখে যাওয়া মিল-ফ্যাক্টরি, টাকা-পয়সা, জায়গা-জমি সমুদয় সম্পদের মধ্যে তার প্রত্যেক ওয়ারিশেরই অংশ থাকে। পরবর্তীতে নিজেরা আপসে বণ্টন করে নেয়। তদ্রূপ নবীজির ওয়ারিশগণ হক্কানী উলামায়ে কেরাম নবীজির রেখে যাওয়া সমস্ত কাজের ওয়ারিশ। নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর ওয়ারিশদের জন্য চারটি কাজ রেখে গিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন :

هُوَ الَّذِى بَعَثَ فِى الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِى ضَلَالٍ مُبِينٍ

অর্থ : তিনি উম্মিদের নিকট তাদেরই মধ্য থেকে একজন রাসূল পাঠিয়েছেন, যিনি তাদের নিকট আল্লাহর আয়াত পড়ে শোনান এবং কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দেয়। (সূরা জুমু'আ, আয়াত ২)

এ আয়াতে হক্কানী উলামায়ে কেরামকে চারটি কাজের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে–

এক. يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ উম্মতের সামনে আল্লাহ তা'আলার আয়াত শুনিয়ে দাওয়াত ও তাবলীগের কাজ করা।

দুই. وَيُزَكِّيهِمْ তাদের আত্মশুদ্ধি করা।

তিন. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ কোরআনের তিলাওয়াত সহীহ করা এবং হুকুম-আহকাম শিক্ষা দেওয়া।

চার. وَالْحِكْمَةَ এবং হাতে-কলমে বাস্তব প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সুন্নাতসমূহ শিক্ষা দেওয়া।

কোনো আলেম এই চারটি কাজ করলে সে-ই হক্কানী আলেম; নবীজির সত্যিকার ওয়ারিশ।

প্রতিটি জিনিসেই আসল-নকল রয়েছে। আল্লাহওয়ালা এবং হক্কানী আলেম নিজ স্বার্থে দুনিয়াদারদের কাছে ঘোরাফেরা করে না। এ কারণে কওমী উলামাগণ সরকারের কাছে ঘেঁষে না, সরকারি সিলেবাস গ্রহণ করে না। যে সমস্ত আলেম দুনিয়াবী স্বার্থে সরকারি লোকদের সাথে, মন্ত্রী-মিনিস্টারদের সাথে উঠাবসা করে, তাদের পক্ষে স্লোগান দেয় তারা দরবারি আলেম। এ সমস্ত আলেমকে দ্বীনের ডাকাত বলা হয়েছে। উলামাগণ দ্বীনের আমানতদার যতক্ষণ পর্যন্ত রাষ্ট্রীয় লোকদের সাথে উঠাবসা না করবে। অন্যথায় তারা দ্বীনের ডাকাত। (কানযুল উম্মাল ১০/২০৪)

আমরা আল্লাহর গোলাম। আল্লাহর গোলামি যেকোনো আলেম থেকে শেখা যাবে না; তাহলে বেঈমান হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।

একবার মওদূদী সাহেব এসেছিলেন আজিমপুরে। ফজরের সময় ঘুম থেকে উঠতেন না। এক আলেম তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, হুজুর! আপনি ফজরের নামায কখন পড়েন? বললেন, আমি রাত ২ট-৩টা পর্যন্ত আল্লাহর

দুশমনদের বিরুদ্ধে কলম দ্বারা যুদ্ধ করি; এ জন্য সময়মতো নামায পড়া আমার পক্ষে সম্ভবপর হয় না। আমি সকাল ৮-৯টার দিকে ফজরের নামায আদায় করে নিই। তো এ ধরনের লোকের মতাদর্শে বিশ্বাসী হলে ঈমান ধ্বংসের আশঙ্কা আছে।

কোন ধরনের আলেম থেকে গোলামি শিখতে হবে, তা আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসূল স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিয়েছেন।

আল্লাহ তা'আলা সূরা ফাতিরের ২৮ নং আয়াতে ইরশাদ করেন :

إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ

আল্লাহওয়ালা উলামাদের দিলে আল্লাহর ভয় বিদ্যমান থাকে। আল্লাহ তা'আলার কোনো হুকুম তারা ছাড়ে না এবং আল্লাহ তা'আলার নিষিদ্ধ কাজের কাছেও যায় না। আল্লাহর ভয়ে তারা কোনো ধরনের নাজায়েয কাজের ধারে-কাছেও যায় না। এ ধরনের আলেমের বয়ান শোনার দ্বারা জীবনের মোড় ঘুরে যায়।

বর্তমানে অনেক বক্তা আছেন, তাঁরা নিজের বয়ান ভিডিও করার জন্য লোক ভাড়া করে নিয়ে আসেন। অথচ প্রাণীর ছবি তোলা সম্পূর্ণ হারাম। নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন :

إن أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة المصورون

অর্থ : হাশরের ময়দানে সবচেয়ে কঠিন আযাব দেওয়া হবে ছবি অঙ্কনকারীকে। (সহীহ বোখারী; হা. নং ৫৯৫০)

তবে শরীয়ত জরুরি প্রয়োজনকে অস্বীকার করে না। ছবি তোলা হারাম বটে; কিন্তু হজ-উমরার জন্য ছবি উঠানো, পাসপোর্ট-ভিসার জন্য ছবি উঠানো, জাতীয় পরিচয়পত্র ইত্যাদির কারণে অপারগতাবশত ছবি উঠানোর অবকাশ আছে। উদাহরণত মরা মুরগি খাওয়া হারাম; কিন্তু অনাহারে মৃতপ্রায় ব্যক্তির জন্য হালাল খাদ্যের ব্যবস্থা না থাকলে জান বাঁচানো পরিমাণ মরা মুরগি খাওয়ার অনুমতি আছে। তো হারাম তার নিজ স্থানে ঠিকই বহাল রয়েছে, কিন্তু নির্দিষ্ট ব্যক্তির জন্য অবকাশ দেওয়া হয়েছে।

বর্তমান যামানার মানুষের রুচিই বদলে গেছে। মাঠ গরমকারী বক্তা দাওয়াত দেয়। উচিত ছিল, ক্বলব ও অন্তর গরমকারী বক্তার দাওয়াত দেওয়া। দ্বীনের কথা শ্রবণের জন্য মাঠ গরমকারী বক্তা তালাশ করা যাবে না। যুক্তিবাদী-চুক্তিবাদী খোঁজ করা যাবে না। যুক্তির নিরিখে বিশ্বাসের নাম শরীয়ত নয়। অন্ধভাবে বিশ্বাসের নাম শরীয়ত। কবরের আযাব, জান্নাত, জাহান্নাম যুক্তি দ্বারা প্রমাণ করা সম্ভব নয়। সায়েন্সের গণ্ডি যেখানে শেষ, শরীয়তের সীমা সেখান থেকেই শুরু। মুমিন হওয়ার জন্য প্রথম শর্ত হলো يؤمنون بالغيب গায়েবের প্রতি বিশ্বাস করা। গায়েব হলো এমন বিষয়াদি, যা চোখ, কান, নাক, জিহ্বা, চামড়া দ্বারা অনুভব করা যায় না, এমনকি বুদ্ধি খাটিয়েও উপলব্ধি করা যায় না; শুধুমাত্র ওহীর আলোকেই তা জানা যায়।

যুক্তিযুক্ত হলে মানব, নইলে মানব না–এমন মনোভাব নিয়ে শরীয়তের বিধানে যুক্তি খোঁজা নাস্তিকের কাজ নাস্তিকরা না দেখার কারণে আল্লাহ তা'আলাকে বিশ্বাস করে না; অথচ তার মায়ের কথার কারণে বাপকে বাপ বলে বিশ্বাস করে। না দেখা সত্ত্বেও শুধুমাত্র একজন মহিলার কথা বিশ্বাস করে যদি কাউকে বাপ বলে ডাকা যায় তাহলে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে সারা আরবের মুশরিকরা পর্যন্ত যার সত্যবাদী হওয়ার স্বীকৃতি দিয়েছে, তিনি স্বচক্ষে মেরাজের রাতে জান্নাত-জাহান্নাম দেখে এসেছেন, আল্লাহ তা'লার দীদার লাভ করেছেন–তাঁর কথার ভিত্তিতে কি আল্লাহ তা'আলাকে বিশ্বাস করা যায় না?

এসব নাস্তিক চতুষ্পদ জন্তু থেকেও অধম। চতুষ্পদ জন্তু তার মালিককে চেনে; কিন্তু নাস্তিকেরা তাদের মালিককেও চেনে না। একটি কুকুরকে তিন দিন হাড় খেতে দিন; আপনার দরজায় পড়ে থাকবে; পিটুনি দিলেও যাবে না। কুকুরের এতটুকু বুঝ আছে যে, এই ব্যক্তি আমার মুনিব; তার পিটুনি দেওয়ার অধিকার আছে; তার দরজা ছেড়ে চলে যাওয়ার অধিকার আমার নেই। কিন্তু নাস্তিকদের এতটুকু বুঝও নেই যে পাহাড়ের নিচ থেকে, সমুদ্রের তলদেশ থেকে যে আল্লাহ গ্যাস-তেল, স্বর্ণ ইত্যাদি খনিজ সম্পদ বের করে আমাদের প্রয়োজন মেটাচ্ছেন তিনিই আমাদের খালিক, আমাদের মালিক। এ সমস্ত লোকের ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা কোরআন পাকে সূরা আ'রাফের ১৭৯ নং আয়াতে ইরশাদ করেন :

أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ

অর্থ : এ সমস্ত লোক চতুষ্পদ জানোয়ারের ন্যায়, বরং এর চেয়েও অধম। এসব লোকই উদাসীন।

কারণ চতুষ্পদ জন্তুও মালিক চেনে কিন্তু তারা মালিক চেনে না। হযরত আলী (রা.)-এর একটি উক্তি দ্বারা বোঝা যায়, আয়াতের মধ্যে চতুষ্পদ জন্তু দ্বারা কুকুরকে বোঝানো হয়েছে।

الدنيا جيفة، وطلابها كلاب

দুনিয়ার দৃষ্টান্ত মৃত জন্তুর ন্যায় আর দুনিয়া-অন্বেষী ব্যক্তিরা কুকুরের ন্যায়। (কাশফুল খফা ১/৪০৯)

উলামায়ে কেরামের দায়িত্ব :

জনসাধারণের ব্যাপারে উলামায়ে কেরামের দায়িত্ব দুই প্রকারের–একটি স্থায়ী, অন্যটি অস্থায়ী।

উলামায়ে কেরামের স্থায়ী দায়িত্ব হলো, জনসাধারণকে ছয়টি জিনিসের তা'লীম দেওয়া। যথা–

এক. শিরকমুক্ত ঈমান শিক্ষা দেওয়া।

দুই. ইবাদত-বন্দেগী তথা নামায, রোযা, হজ, যাকাত, কাফন-দাফনসহ সমস্ত আমলের সহীহ তরীকা শিক্ষা দেওয়া।

তিন. হালাল পন্থায় আয়-উপার্জনের তরীকা শিক্ষা দেওয়া।

পিতা-মাতার মৃত্যুর পর সপ্তাহ-দশ দিনের মধ্যে ফারায়েয বের করে ওয়ারিশদের প্রত্যেকের অংশ বুঝিয়ে দিতে হবে। অথচ আমাদের সমাজে আট-দশ বছরেও ভাইয়েরা বোনদের অংশ বুঝিয়ে দেয় না। এসব ক্ষেত্রে বোনদের হক্ব নষ্ট করা হয়। এ প্রক্রিয়ায় অনেক সময় এতিমের মাল ভক্ষণ করা হয়। এগুলো সম্পূর্ণ হারাম।

চার. বান্দার হক্ব আদায়ের ব্যাপারে সচেষ্ট বানানো।

পিতা-মাতার হক্ব, স্বামী-স্ত্রীর হক, সন্তানাদি, ভাই-বোন ও পাড়া-প্রতিবেশীর হক্ব, এমনকি জীবজন্তুর হক্ব আদায়ের ব্যাপারেও যত্নশীল বানানো। অন্য সকল হক আল্লাহ তা'আলা চাইলে মাফ করে দেবেন। কিন্তু বান্দার হক্ব বান্দা মাফ না করলে আল্লাহ তা'আলাও মাফ করবেন না; বরং হাশরের ময়দানে নেকী দ্বারা হক্ব আদায় করা হবে। নেকী না থাকলে অন্যের গোনাহ তাকে বহন করতে হবে। (শু'আবুল ঈমান; হা. নং ৫১৭২)

পাঁচ. সাধারণ মানুষের আত্মশুদ্ধির ফিকির করা। শরীরের রোগের চিকিৎসা করা সুন্নাত; অন্তরের রোগের চিকিৎসা করা ফরযে আইন। অন্তরের চিকিৎসার পন্থা হলো আল্লাহওয়ালাদের সোহবত গ্রহণ করা। সাহাবায়ে কেরামের হাজারো গুণাবলি ছিল; কোনো গুণ দ্বারা তাদের নামকরণ করা হয়নি; শুধুমাত্র নবীজির সোহবত অবলম্বনের গুণের ভিত্তিতে বলা হয়েছে সাহাবী। হিংসা-বিদ্বেষ, ক্রোধ, অহংকার, রিয়া, কৃপণতা, লোভ-লালসা, আত্মতুষ্টি, পরশ্রীকাতরতা–অন্তরের এ রোগগুলোর প্রতিটিই ক্যান্সারের মতো। অন্তরের রোগের কারণেই বাহ্যিক গোনাহ প্রকাশ পায়।

ছয়. দাওয়াত ও তাবলীগের জন্য সময় বের করা।

ইসলাম আল্লাহ তা'আলার একমাত্র মনোনীত ধর্ম; কেয়ামত পর্যন্ত নতুন কোনো নবী আসবেন না। কাজেই এই দ্বীনকে প্রতিষ্ঠিত রাখার জন্য আল্লাহর রাসূলের পক্ষ থেকে উলামা এবং জনসাধারণ সকলের ওপর দাওয়াতের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে এবং এ কারণেই কোরআন পাকে আমাদেরকে সর্বোত্তম জাতি বলা হয়েছে। (সূরা আলে ইমরান-১১০)

উলামায়ে কেরামের অস্থায়ী দায়িত্ব হলো, যেকোনো ধরনের বাতিল মাথাচাড়া দিয়ে উঠলে তা প্রতিরোধ করা।

উদাহরণত সাহাবা-বিদ্বেষী ও সাহাবাদের দোষচর্চাকারী দল, কাদিয়ানী সম্প্রদায়, শিয়া মতবাদ, লা-মাযহাবী ফিতনাসহ সকল ফিতনা সম্পর্কে সজাগ থাকা।

সাহাবা-বিদ্বেষী ও সাহাবাদের দোষচর্চাকারী দলের ফিতনা ঈমান বিধ্বংসী ফিতনা। এ দলের প্রতিষ্ঠাতা মওদূদী সাহেব তাঁর এক কিতাবে লিখেছেন, আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক নবীকে দিয়ে কয়েকটি কবীরা গোনাহ করিয়েছেন। আরেক কিতাবে লিখেছেন, রাসূলে খোদা ছাড়া কাউকে সত্যের মাপকাঠি বলা যাবে না। অথচ আমি কোরআন থেকে প্রায় দশটি আয়াত পেশ করতে পারব, যেখানে হাযারাতে সাহাবায়ে কেরাম (রা.)-কে সত্যের মাপকাঠি বলা হয়েছে।

অনুরূপভাবে কাদিয়ানী সম্প্রদায় আমাদের নবীকে শেষ নবী মানে না। অথচ এ ব্যাপারে কোরআন-হাদীসে বহু সুস্পষ্ট বাণী বিদ্যমান। তারা দাবি করে, পাকিস্তানের কাদিয়ান শহরে নাকি গোলাম আহমাদ নামে নতুন নবীর আবির্ভাব ঘটেছিল। (নাউযুবিল্লাহ) কোরআন-হাদীসের সুস্পষ্ট বাণী অস্বীকার করায় এবং তার ভ্রান্ত ব্যাখ্যা করায় তারা কাফের।

অনুরূপভাবে শিয়ারাও একটি অমুসলিম সম্প্রদায়। তারা আমাদের কোরআনকে হযরত উসমান (রা.)-এর বানানো বলে দাবি করে। আসল কোরআনে নাকি ১৭ হাজার আয়াত থাকতে হবে। অথচ বর্তমান কোরআনের আয়াত সংখ্যা ৬ হাজার ২৩৬।

আবার লা-মাযহাবী বা আহলুল হাদীস নামে বর্তমানে এক ফিরকা বের হয়েছে। তারা নিজেদের নাম দিয়েছে আহলুল হাদীস; কিন্তু হাদীসের কিছুই বোঝে না। এই ফিরকার গোমরাহী বোঝানোর জন্য আমি চারটি কিতাব লিখেছি–হাদীসে রাসূল, তুহফাতুল হাদীস, মাযহাব ও তাকলীদ এবং হাদিয়ায়ে আহলুল হাদীস।

অনুরূপভাবে ডাক্তার জাকির নায়েকের কারণেও বহু মুসলমানের ঘরে টেলিভিশন আমদানি হয়েছে। ডাক্তার হয়ে তিনি ফতওয়া দিতে পারলে মুফতী সাহেবরাও তাঁর টিউমার অপারেশন করতে পারবেন!!

যা হোক, আল্লাহ তা'আলার অশেষ মেহেরবানিতে আজকের আলোচনায় ইলমের গুরুত্ব, হক্কানী উলামায়ে কেরামের আলামত, উলামায়ে কেরামের স্থায়ী এবং অস্থায়ী দায়িত্ব সংক্ষিপ্তভাবে আলোচনা করা হলো। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সকলকে হক্কানী উলামায়ে কেরাম চিনে তাদের সাহচর্য লাভ করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

শ্রুতিলিখন : মাওলানা মুহাম্মাদ ইসমাতুল্লাহ

শান্তি ও মুক্তি কোন পথে

মাওলানা সায়্যিদ আরশাদ মাদানী দা.বা. সিনিয়র মুহাদ্দিস দারুল উলূম দেওবন্দ

ইসলামী সম্মেলন সংস্থা বাংলাদেশের উদ্যোগে চট্টগ্রাম জমিয়তুল ফালাহ ময়দানে অনুষ্ঠিত দুই দিনব্যাপী ৩২তম আন্তর্জাতিক ইসলামী মহাসম্মেলনে প্রথম দিন প্রধান অতিথি হিসেবে প্রদত্ত গুরুত্বপূর্ণ বয়ানের বঙ্গানুবাদ।

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلامضل له ومن يضلله فلاهادى له ونشهد ان لا إله الاالله وحده لاشريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله ـ

اما بعد ـ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ـ يا ابا بكر ثلاث كلهن حق ما من عبدظلم بمظلمة فيعفو عنها لله تبارك وتعالى إلا أعزالله بها نصرا وما من رجل فتح باب عطية يريد بها صلة إلازادالله بها كثرة ومامن رجل فتح باب مسئلة يريد بها كثرة الازاد الله بها قلة ـ

আমার শ্রদ্ধেয় বুজুর্গানে দ্বীন, বন্ধুগণ, আজীজ তালাবাহ ও প্রিয় এলাকাবাসী! এই সম্মেলন আক্বায়ে নামদার, তাজেদারে মদীনা, উভয় জাহানের সর্দার হযরত মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর পবিত্র সীরাত বয়ান করার লক্ষ্যে হযরত ফিদায়ে মিল্লাত মাওলানা আসাদ মাদানী সাহেব (রহ.), হযরত ফকীহুল মিল্লাত মাওলানা আব্দুর রহমান সাহেব (রহ.) এবং তাঁদের আরো অন্য সহকর্মীরা প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। এখন হযরত ফকীহুল মিল্লাত সাহেব (রহ.)-এর সুযোগ্য সাহেবজাদা এবং হযরত মাদানী (রহ.)-এর মুতাওস্সিলীন এবং মুহাব্বতকারী বন্ধুগণ, যাঁরা দ্বীনের সাথে জড়িত, দ্বীনকে ভালোবাসে তাঁরা এই মহাসম্মেলনকে আরো এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে প্রাণপণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। যাতে করে দ্বীন, শরীয়ত, আকীদা-বিশ্বাস, ইবাদত, কোরআন এবং রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর হেদায়াত পৌঁছতে পারে।

সাধারণত সীরাত ও এ বিষয়ের নামে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর জন্ম, তাঁর বাল্যকাল সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়। কিন্তু বিশ্ব এ কথা জানে যে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আল্লাহর রাসূল তখনই হলেন, যখন তাঁর বয়স ৪০ হয়েছে এর পূর্বে তাঁর ওপর ওহী আসত না। আল্লাহ তা'আলার আয়াত অবতীর্ণ হতো না, জিব্রাঈল আমীন আসতেন না। যখন তাঁর বয়স মুবারক ৪০ বছর হলো তখন তাঁর কাছে জিব্রাঈল আমীন এসেছেন। ওহী নাজিল হলো। কোরআন নাজিল হওয়া আরম্ভ হলো। তখনই তিনি রাসূল হলেন। আল্লাহ তা'আলার প্রেরিত দূত হলেন। এর অর্থ হলো, যে কথাগুলো তাঁর মুখ দিয়ে বের হবে সেগুলো সত্য, তিনি যে কাজগুলো করছেন সেগুলো হক ও সত্য। যেগুলো তিনি পেশ করছেন সেগুলো হক ও সত্য। প্রকৃতপক্ষে তাঁর ওই জীবন, যাকে ইসলাম ও শরীয়ত বলে সেটি হলো রাসূল হওয়ার পরবর্তী জীবনই। ৪০ বছর পরের জীবন। যখন তিনি নবী। যা কিছু তিনি বলেছেন এগুলোই প্রকৃতপক্ষে সীরাতে মুবারাকাহ। উম্মতকে তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করার জন্য আদেশ দেওয়া হয়েছে। প্রত্যেক নবী দুনিয়াতে সর্বপ্রথম যে হুকুমটি দিয়েছেন সেটি এক মৌলিক হুকুম لاالٰه الاالله আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। হযরত আদম (আ.) থেকে আমাদের সর্দার আক্বায়ে নামদার হযরত মুহাম্মদ (সা.) পর্যন্ত সবারই এই একই আদেশ ছিল দুনিয়াবাসীর প্রতি। লাইলাহা ইল্লাল্লাহ–আল্লাহ ছাড়া আর কোনো মাবুদ নেই। দুনিয়াবাসীর সাথে তাঁদের মতবিরোধ ছিল শুধু এটির কারণেই। প্রত্যেক নবীর সঙ্গে মতবিরোধ হওয়ার একমাত্র মূল ভিত্তি এটিই। হযরত নূহ (আ.)-এর সঙ্গে কেন মতবিরোধ হলো উম্মতের। তিনি বলতেন لاالٰه الاالله আল্লাহ ছাড়া কোনো প্রভু নেই। প্রতিমা ছেড়ে দাও, এগুলোকে ভেঙে দাও। তারা বলত ছাড়ব না।

لاتذرن ودا ولاسواعا ولايغوث ويعوق ونسرا

ওয়াদ, সুয়া, ইয়াগুসা, ইয়াউক এবং নাস্র–এই পাঁচটি ছিল তাদের বড় বড় ভূত। তারা বলত এগুলোকে ছেড়ো না। হযরত ইব্রাহীম (আ.)-কে কেন আগুনে নিক্ষেপ করা হলো? সেই একই কারণে যে তিনি প্রতিমা-মূর্তিবিরোধী ছিলেন। তাঁর মনমানসিকতা বাল্যকাল থেকে এ

রকম ছিল যে মূর্তিপূজা করা যাবে না। তাফসীরবিদরা বলেছেন, ইব্রাহীম (আ.)-এর পিতা আজর মূর্তি বানাতেন, এবং সেগুলো ছেলেকে দিয়ে বলতেন যে এগুলো বাজারে নিয়ে যাও এবং বিক্রি করে আসো। তিনি এগুলো বাজারে নিয়ে যেতেন, সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত এলান করতেন যে আমার থেকে কে এমন প্রভু কিনবে, যা না কোনো উপকার করতে পারে, না অপকার? এ বলে বলে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত বাজারে ঘুরে বেড়াতেন। যখন কেউ কিনত না তখন সন্ধ্যায় বাড়িতে গিয়ে সেই মূর্তিগুলো পানিতে ডুবিয়ে দিতেন। বাল্যকাল থেকেই নবীদের মনমানসিকতা এমনই সৃষ্টি করা হয় যে এক আল্লাহরই ইবাদত হবে। কেউই তাঁর শরীক হবে না। হযরত ইব্রাহীম (আ.) যখন নবী হয়ে গেলেন, তখন বাবাকে বললেন :

يابت لم تعبد مالايسمع ولايبصر

হে আব্বা! কেন এই ভূতপূজা করেন? যা না শুনতে পারে, না দেখতে পারে? এই ছিল মতবিরোধ, যার কারণে জীবিত ব্যক্তিকে পুড়ে মারার জন্য আগুনে নিক্ষেপ করা হলো। কারণ তারা বলেছে যে আমরা বলি এটি আমাদের ভূত-প্রভু, আর তিনি (ইব্রাহীম) (আ.) বলেন, এগুলো প্রভু নয়। আল্লাহ তো একমাত্র তিনিই, যিনি আসমান-জমিনের স্রষ্টা। এটাই হলো আম্বীয়াদের সীরাত।

আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) যে মক্কাতে জন্মগ্রহণ করেছেন, সেখানে ৪০ বছর পর্যন্ত জীবন যাপন করেছেন। এরপর নবুওয়াতপ্রাপ্ত হয়েছেন, নবুওয়াতের পর ১৩ বছর আরো ছিলেন। ওই সময় মক্কাতে অধিকাংশ লোক মূর্তিপূজারী ছিল। হয়তো দু-একজন এর ব্যতিক্রম থাকতে পারে। এখানে বেশির ভাগই ছিল মূর্তিপূজক। বায়তুল্লাহর আশপাশে ৩৬০টি ভূত রাখা হয়েছিল, প্রতিদিন একেকটি নতুন প্রভুর ইবাদত হতো। এমন পরিবেশেই রাসূল (সা.)-কে প্রেরণ করা হলো রিসালাত এবং নবুওয়াত প্রদান করে।

আদেশ দেওয়া হলো যে হে মুহাম্মদ উঠো! قم فانذر যারা আল্লাহর সাথে শিরিক করে তাদের আল্লাহর ভয়াবহ আজাব-শাস্তি থেকে ভীতি প্রদর্শন করো। এক আল্লাহর তাকবীর বলো الله اكبر কিন্তু ওরা এগুলো কিছুই মানত না। তারা আশ্চর্য হয়ে বলত আল্লাহ এক কিভাবে হয় :

بل عجبوا ان جاء هم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب

প্রত্যেক নবীর সর্বপ্রথম সংবাদ হলো আল্লাহ এক ও অদ্বিতীয়, তাঁর কোনো শরীক নেই। "শরীক নেই"-এর অর্থ কী? এর অর্থ হলো, (১) আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো ইবাদত করা যাবে না। (২) কাউকে সিজদা করা যাবে না। (৩) কারো নামায পড়া যাবে না। (৪) কারো হজ করা যাবে না। নামায, রোজা, হজ, ইবাদত শুধুমাত্র এক আল্লাহর জন্যই করা হবে, অন্য কারো জন্য নয়। (৫) আর কারো কাছে কিছু চাওয়া যাবে না। এর অর্থ হলো, আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ ইজ্জত-সম্মান দিতে পারে না, কেউ সন্তান দিতে পারে না, কেউ মৃত্যু দিতে পারে না। প্রত্যেক বস্তুর খাজানা হলো একমাত্র আল্লাহর কাছেই। কেউ দিতেও পারে না, দেওয়াতেও পারে না। আল্লাহই একমাত্র দেয়-দেওয়ায়। রাসূলুল্লাহ (সা.) এসে আল্লাহ তা'আলার এই পয়গাম পৌঁছে দিয়েছেন।

বড় বড় মান-সম্মানের অধিকারী অনেক সাহাবী রাসূল (সা.) জীবিত থাকা অবস্থায় দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়ে গেছেন, কারো কবরে গিয়ে সিজদা করা হয়েছে, এমন কোনো প্রমাণ নেই। না কারো নামায প্রমাণিত। অথচ তাঁরা কারা? তাঁরা তো সাহাবা। যে দ্বীন রাসূল (সা.) দিয়ে গেছেন লক্ষ লক্ষ সাহাবীকে। কোথাও এ কথার প্রমাণ নেই যে তাঁদের মধ্যে কেউ রাসূল (সা.)-এর কবরে গিয়ে সিজদা করতেন? কারণ সিজদা শুধুমাত্র আল্লাহকেই করা হবে, তিনি ব্যতীত আর কাউকে সিজদা করা যাবে না।

যখন কিয়ামত কাছে আসবে তখনও ঈমানের জন্য সবচেয়ে বড় ফেতনা আসবে। এই ফিতনা এখনো আসেনি। এখন তো দেখা যাচ্ছে কেউ কবরপূজা করছে আর কেউ ভণ্ডপীরের মাজারে সিজদা করছে। এগুলো তো ওই ফেতনার তুলনায় কিছুই নয় বা একেবারেই নগণ্য। কিয়ামত নিকটবর্তী ওই বড় ফেতনার নাম হলো দাজ্জালি ফেতনা। সেই কানা দাজ্জাল বলবে আমি আল্লাহ, আল্লাহকে সিজদা করো না, আমাকে সিজদা করো। সমস্ত আসমান-জমিন আমার মুঠোয়। সে আসমানকে বলবে, বৃষ্টি বর্ষণ করো আসমান বৃষ্টি বর্ষণ করবে। জমিকে বলবে খাজানা-খনি বের করে দাও তখন জমিন খনি বের করে দেবে। সে মানুষদের বলবে আমি কি আল্লাহ নই? যার অন্তরে لااله الاالله নেই, সে এই মুসিবতে গ্রেফতার হয়ে যাবে এবং বলবে রাম-রাম আল্লাহ আল্লাহ। কিন্তু ওই মুমিন, যার অন্তরে لااله الاالله দৃঢ়ভাবে বসে আছে সে কোনো প্রকারেই প্রভাবিত হবে না। সে ঈমান তার ওপর আনবে না। বরং সে বলবে, তুমি কোনো আল্লাহ নও। হতেও পারো না। আমার আল্লাহ তো এক ও অদ্বিতীয়। দাজ্জাল বলবে, আমি আল্লাহ। আমার হাত থেকে কে রক্ষা পাবে? স্বীয় ঈমানের হেফাজত কে করবে? যে মুমিন কোনো

গায়রুল্লাহকে সিজদা করতেন না,
রাসূলুল্লাহকে সত্য রাসূল হিসেবে বিশ্বাস করতেন, আল্লাহ তা'আলা তাঁর দ্বীন ঈমানের হেফাজত করবেন। এটাকে কোরআনের ভাষায় এভাবে উল্লেখ করেছেন :

يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت فى الحياة الدنيا وفى الاخرة

বড় বড় ফেতনার সম্মুখীন হবে, পৃথিবীর পরাশক্তি একত্রিত হয়ে বোমা নিক্ষেপ করবে। ঝগড়াটার মূল কারণ কী? ঝগড়াটি হলো এই সারা পৃথিবীতে যারা আল্লাহর সাথে শরীক করে তারা এক দিকে আর যারা

لااله الاالله محمد رسول الله

বলে, অর্থাৎ মুসলিম জাতি তারা একা একদিকে। বড় বড় বোমা নিক্ষেপ করা হয়েছে; কিন্তু মসজিদ থেকে কি আজানের ধ্বনি বন্ধ হয়ে গেছে?

الله اكبر اشهد ان لااله الاالله اشهد ان محمدا رسول الله

কি খতম হয়ে গেছে? কারণ কী? কারণ আল্লাহ তা'আলাই বলছেন :

يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت فى الحياة الدنيا

আল্লাহ তা'আলা মুমিনদের ঈমানকে আরো দৃঢ় ও শক্ত করে দেবেন। পৃথিবীতে যখন কিয়ামতের নিকটবর্তী সময়ে দাজ্জালের ফেতনা আবির্ভূত হবে তখনো যাদের অন্তরে কোনো ঈমান ছিল না, যারা গায়রুল্লাহকে সিজদা করত। মূর্তিপূজা করত, কবরকে সিজদা করত এগুলো নিজের প্রয়োজনাদি পূর্ণকারী বলে বিশ্বাস করত। মনে করত যে তাদের হাতেই ধনসম্পদ। এ রূপ ধারণা পোষণকারীদের ঈমানের কোনো হদিস পাওয়া যাবে না।

আর যাঁরা এক আল্লাহ ব্যতীত কাউকে সিজদা করতেন না, তাঁদের দ্বীন ও ঈমানের হেফাজত আল্লাহই করবেন। আল্লাহর নবী বলেন, দাজ্জাল মদীনা মুনাওয়ারার কাছাকাছি পৌঁছবে; কিন্তু ফেরেশতারা মদীনা মুনাওয়ারাকে হেফাজত করবেন। এই কাফের আল্লাহকে অস্বীকারকারী, আল্লাহ হওয়ার দাবিদারকে মদীনায় ঢুকতে দেবে না ফেরেশতারা। একজন ব্যক্তি মদীনা মুনাওয়ারা থেকে বাইরে আসবে। এসে লোকজনকে বলবে, ভাই! কী হলো? লোকেরা বলবে যে, এটা আমাদের আল্লাহ। এর হাতেই আসমান-জমিনের সব খাজানা। তখন ওই লোকটি বলবে, এটা তো অন্ধ-কানা। সে কিভাবে আল্লাহ হবে। আমার আল্লাহ তো এমন এক সত্ত্বা, যিনি সমস্ত দোষ-ত্রুটি থেকে একেবারেই পাক ও পবিত্র। এর চেহারা-সূরত দেখলে তো ভয় লাগে, সে কখনো আল্লাহ হতে পারে না। লোকেরা ওই ব্যক্তিকে ধরে নিয়ে দাজ্জালের কাছে নিয়ে যাবে। দাজ্জাল তাকে জিজ্ঞাসা করবে যে, তুমি কি আমাকে আল্লাহ বিশ্বাস করো? সে নির্দ্বিধায় বলবে না, না, তোমার দৃশ্য নিজেই আয়নাতে দেখে নাও। তুমি কেমন? তখন দাজ্জাল তাকে হত্যা করবে। পুরো শরীরকে দুই টুকরো করে দুই দিকে ফেলে দেবে।

অতঃপর এই হত্যাকৃত মৃত ব্যক্তিকে আবার জীবিত করা হবে, তখন সে জীবিত হয়ে আবার উঠবে। অতঃপর দাজ্জাল তাকে আবার জিজ্ঞাসা করবে যে, এখন কি আমাকে আল্লাহ হিসেবে বিশ্বাস করো? সে বলবে, না না مـــازاد الا ايـمانا بانك دجال এখন তো আমার ঈমান আরো দৃঢ় ও শক্তিশালী হয়ে গেছে যে, তুমি তো দাজ্জালই। তুমি কখনো আল্লাহ হতে পারো না।

কে তার ঈমানকে হেফাজত করছেন? কিয়ামত পর্যন্ত মুমিনদের হেফাজত, তাঁদের ঈমানের হেফাজত একমাত্র আল্লাহ তা'আলাই করে থাকেন। এটাকেই কোরআন বলছে :

فى الدنيا وفى الاخرة

দুনিয়াতে এবং আখিরাতেও। আখিরাতেরও দুটি স্তর আছে। একটি হলো বরজখ, অর্থাৎ কবর, দ্বিতীয়টি হলো, হাশরের দিন। কবরে ফেরেশতা এসে জিজ্ঞাসা করবে مـــــــن ربك তোমার প্রভু কে? মুমিন বলবে, ربى الله আমার প্রভু এক আল্লাহ। তার মুখ দিয়ে এগুলো কে বলাচ্ছে? কোনো শিক্ষক নেই, মা-বাবা নেই, কোনো মাদরাসা নেই। নেই কোনো বন্ধুও। সে একাই কবরে, ফেরেশতারা জিজ্ঞাসা করছে, বলো তোমার রব কে? সে কিভাবে ربى الله বলে উত্তর দিচ্ছে? কে তার ঈমানের হেফাজত করছেন? একমাত্র আল্লাহ। অতঃপর জিজ্ঞাসা করবে ومـــادينك তোমার ধর্ম কী? তখন সে বলবে,

আমার ধর্ম তো আল্লাহ এবং রাসূলুল্লাহর অনুসরণ-অনুকরণ, অর্থাৎ ইসলাম। এগুলো এর মুখ দিয়ে কে বলাচ্ছে? কে তার অন্তরে এই জবাবগুলো ঢালছে? একমাত্র আল্লাহ। অতঃপর তৃতীয় প্রশ্ন করা হবে বলো, এই কে? কেউ কেউ বলেন, রাসূলুল্লাহ (আ.)-এর মুবারক ফটো সামনে আনা হবে। আর কেউ কেউ বলেন, মৃত ব্যক্তির কবর থেকে নিয়ে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর মুবারক কবর পর্যন্ত জমিনকে সরিয়ে দেওয়া হবে। সে দেখবে রাসূল (সা.) শায়িত অবস্থায় আরাম করছেন। ফেরেশতারা তাঁর দিকে ইশারা করে জিজ্ঞাসা করবেন। বলো এই ব্যক্তি কে? তখন সে ব্যক্তি বলবে, তিনি তো রাসূলুল্লাহ মুহাম্মদ আরবী (সা.), তাঁকেই তো নবী বানিয়ে পাঠানো হয়েছিল। তখন ফেরেশতা জিজ্ঞেস করবেন–আ রে! তুমি তো তাঁকে দুনিয়াতে কখনো দেখোনি। দুনিয়াতে তাঁর কোনো ছবিও নেই, তা সত্ত্বেও তুমি তাঁকে চিনতে পেরেছ

কিভাবে? তিনি তো মক্কাতে জন্মগ্রহণ করেছেন এবং মদীনা মুনাওয়ারায় পর্দার আড়ালে চলে গেলেন (অর্থাৎ রওজা শরীফে শায়িত হলেন)। তুমি চট্টগ্রামের মাটিতে চৌদ্দ শত বছর পরে এসে তাঁকে কিভাবে চিনলে? তখন সে বলবে :

قرأت كتاب الله وصدقت به

আমি তো দুনিয়াতে আল্লাহর কিতাব পড়তাম আর এই কিতাবটি তিনিই নিয়ে এসেছিলেন, আমি বিশ্বাস করতাম, এটি আল্লাহর কিতাব আর তিনি হলেন আল্লাহ তা'আলার প্রেরিত রাসূল (সা.। আমার চোখে তাঁকে দেখিনি, কিন্তু আমার আত্মা এবং রূহের সম্পর্ক এত দৃঢ় ও শক্তিশালী যে আমি তাঁকে চোখে না দেখা সত্ত্বেও আমার অন্তর সাক্ষ্য দেয় যে তিনি রাসূলুল্লাহ, যিনি কিতাব নিয়ে এসেছেন, যা তিনি পড়েছেন। এগুলো তাঁর মুখ দিয়ে কে বলাচ্ছে? একমাত্র আল্লাহই। প্রত্যেক নবী-রাসূলগণের সাথে ঝগড়ার মূল কারণ এটিই। দুনিয়ার লোকেরা বলে, আল্লাহ এক নন বরং শত শত মা'বুদ আছে। কিন্তু রাসূল বলেন, না না, মা'বুদ শুধু এক আল্লাহ। তিনি ব্যতীত অন্য কোনো মা'বুদ নেই। দুনিয়াতে যারা যাকে পূজা করত, যারা সেগুলোকে মা'বুদ হিসেবে মানত সেগুলোকে তাদের সামনে নিয়ে আসা হবে। আল্লাহ তা'আলা বলবেন যাও। তাদের পেছনে পেছনে চলো। সবাই উঠে তাদের পেছনে পেছনে চলবে। ভারত-বাংলাদেশের কেউ রাম, কেউ পাথর, আর কেউ অন্য কিছুকে ভগবান মানে। কেউ পাথরের পূজা করে, কেউ স্বর্ণকে পূজা করে। কাল হাশরের ময়দানে যে যার ইবাদত করে সেগুলোকে তাদের সামনে আনা হবে। বলা হবে যাও, চলো। সবাই উঠে ওই মূর্তিগুলোর পেছনে পেছনে চলে যাবে। হাশরের মাঠে একা এই উম্মতই রয়ে যাবে। যারা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো ইবাদত করত না।

নবী করীম (সা.) ইরশাদ করেন, সেখানে একটি পরীক্ষা হবে। পরীক্ষাটি কী হবে? পরীক্ষা পরীক্ষার মতোই হবে। আল্লাহ তা'আলা অন্য সূরতে আসবে। এবং বলবে–যাও, এর সাথে যাও। এরা বলবে, না। এটা আমাদের আল্লাহ নয়। আমাদের আল্লাহ যখন আমাদের সামনে আসবেন আমরা তাঁকে চিনে ফেলব–

الله ربنا وهذا مكاننا حتى نرى ربنا

আমাদের আল্লাহ তো আল্লাহই, তিনিই আমাদের রব। আমরা এখানেই থাকব। আমাদের রব না আসা পর্যন্ত আমরা এখান থেকে সরব না। তখন তিনি চলে যাবেন। অতঃপর অন্য আকৃতিতে পুনরায় প্রকাশ হবেন, কিন্তু ওরা বলবে, আমরা এখান থেকে যাব না। যতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের রব আমাদের সামনে আসবে না। আমরা এখান থেকে সরব না। দুই-তিনবার এ রকমই হবে এমনকি–

يوم يكشف عن ساق ويدعون الى السجود وهم سالمون

শেষে আল্লাহ তা'আলার সত্ত্বা প্রকাশ হবেন مايليق لشأنه তাঁর শান অনুযায়ী দৃশ্যমান হবেন।

কে তাদের এমন শক্তিশালী করবেন যে, এখান থেকে সরা যাবে না? এখানেই থাকতে হবে। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলছেন يأمرهم يمنعهم তিনি আদেশও করছেন আবার বলছেন যাওয়া নয় বরং এখানেই অটল থাকতে হবে। এরূপ দৃঢ় ও শক্তিশালী কে করছেন? একমাত্র আল্লাহ। এটার নাম হলো তাওহীদ।

প্রকৃতপক্ষে রাসূলুল্লাহর মুবারক সীরাত হলো ওই শিক্ষা, যা তিনি উম্মতকে দান করেছেন। ওই শিক্ষাই হলো মূলত দ্বীন ও ইসলাম। আদম সন্তানের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও জরুরি বিষয় সেটি। যা ব্যতীত কোনো মানুষের নাজাত হতে পারবে না। সেটি হলো ঈমান। অন্তরে এ কথা বিশ্বাস করা যে,

لااله الاالله محمدرسول الله

অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া কোনো মা'বুদ নেই হযরত মুহাম্মদ (সা.) আল্লাহর প্রেরিত বান্দা ও রাসূল। এটাই হলো ঈমান।

দ্বিতীয় বিষয় হলো ইবাদত। নামায, রোজা, হজ ও যাকাত। এগুলো হলো ইবাদত, যা প্রতিটি মানুষের ওপর ফরয।

তৃতীয় আরো একটি বিষয় আছে, সেটি হলো অন্ন-বস্ত্র-বাসস্থান ও লেনদেন। পরস্পর বসবাস কিভাবে করতে হবে? এটাও অনেক গুরুত্বপূর্ণ দ্বীনি বিষয়। মুসলমানরা মনে করে যে দ্বীন হলো দুটি বিষয়ের নাম ঈমান আর ইবাদত। কিন্তু এ ধারণা একেবারেই ভুল। মানুষ স্বীয় সীরাত দ্বারাই চেনা যায়। দুনিয়াতে সে কী সবক শিক্ষা দেয়? এখান থেকেই বোঝা যাবে সে ব্যক্তি কত বড়। তার স্বীয় জীবন কেমন? সে নিজের ছাত্রদের কী শিক্ষাদান করে? তা দ্বারা উপলব্ধি করা যায় মানুষটির মান-মর্যাদা কতটুকু? ইসলাম এভাবে প্রচারিত হয়েছে। তার প্রচার-প্রসার, সামাজিকতা, লেনদেন, আখলাখ-চরিত্র কেমন? মানুষদের কী শিক্ষা দেয়? এগুলো দ্বারাই মানুষের মান-মর্যাদা নির্ণয় করা যায়। যদি তার শিক্ষা-সবক খারাপ হয়, যেমন মানুষকে চুরি শিক্ষা দেয়, ডাকাতি শিক্ষা দেয়, অপরের মাল ছিনিয়ে নেওয়া শিক্ষা দেয়, এর অর্থ হলো, এই মানুষটি খুবই খারাপ। আল্লাহর নবী এগুলো শিক্ষা দেননি। রাসূলুল্লাহর শিক্ষা হলো যে, দুনিয়াতে কারো হক মারা বা কারো হক ছিনিয়ে নেওয়া এত বড় পাপ, এত বড় পাপ যে, কাল হাশরের দিন ওই পাপীর নামায, রোজা ও হজের সমস্ত সওয়াব ছিনিয়ে নেওয়ার আশঙ্কা আছে। কারণ

সে অন্যের হক ছিনিয়ে নিয়েছে। এগুলোই হলো রাসূলের সীরাতে মুবারাকাহ। মুসলমানরা তো এগুলো শোনে না। কিছু কিচ্ছা-কাহিনী শুনে মনে করেছে যে আমি সীরাতের জলসাতে অংশগ্রহণ করেছি। না না না। লেনদেন এবং মুয়াশারাহ এমন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যে, এগুলোর কারণেই হাশরের দিন নামায, রোজা, হজ, সদকা–সবই ছিনিয়ে যাওয়ার আশঙ্কা করা হচ্ছে। কারণ দুনিয়াতে তার লেনদেন খারাপ ছিল।

রাসূলুল্লাহ (সা.) সাহাবায়ে কেরামকে জিজ্ঞেস করলেন যে ফকির কাকে বলে? উত্তরে সাহাবারা বললেন, আল্লাহর রাসূল (সা.) ফকির হলো ওই ব্যক্তি, যার কাছে কোনো টাকা-পয়সা, ঘরবাড়ি কিছুই নেই। তখন রাসূল (সা.) বললেন যে তোমরা তো ঠিকই বলেছো। কিন্তু আমার উম্মতের মধ্যে প্রকৃতপক্ষে ফকির হলো ওই ব্যক্তি, যে দুনিয়া থেকে নামায, রোজা, হজ, সদকা ইত্যাদি সবই নিয়ে রোজ হাশরে হাজির হবে। সে নামায পড়ত, হজ করত, রোজা রাখত, উমরা করত, সদকাও করত–এগুলো সব নিয়ে গেছে। তবে কারো ধন-সম্পদ কেড়ে নিয়েছে, কারো হক ছিনিয়ে নিয়েছে, বসতবাড়ি জবরদখল করে নিয়েছে, কাউকে হত্যা করেছে। এগুলোর কারণে তার পেছনে একটি দুনিয়া, (অর্থাৎ যাদের হক ছিনিয়ে নিয়েছিল তারা) ঘুরে বেড়াচ্ছে এবং ফরিয়াদ করছে যে হে আল্লাহ! আমাদের হক-প্রাপ্য উদ্ধার করে দেন। এখন সে কোথা থেকে দেবে এগুলো? কিছুই তো নেই। তাই কেউ নামাযের সওয়াব নিয়ে যাবে, কেউ হজের সওয়াব নিয়ে যাবে, আর কেউ রোজার সওয়াব নিয়ে যাবে। এভাবে তার সমস্ত সওয়াব ছিনিয়ে নেওয়া হলো। কেননা তার লেনদেন মুআশারা খুবই খারাপ ছিল, ভালো ছিল না। সে নির্যাতন করত, এ কারণে সবই খতম হয়ে গেল। আমি যে হাদীসটি পড়েছি, সেটি এ রকমই। আমি তিনটি বিষয় পড়েছিলাম। আল্লাহর নবী বলেছেন, যে ব্যক্তি কারো ওপর নির্যাতন করেছে, কারো মাল-সম্পদ ছিনিয়ে নিয়েছে, কারো জমির ওপর জবরদখল করেছে, অথবা কাউকে লাঞ্ছিত করেছে, এটাও এগুলোর অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু যার সম্পদ চলে গেছে সে বলে, হে আল্লাহ! তুমিই দিয়েছিলে, তুমিই ছিনিয়ে নিয়েছ। ব্যস, আমি ছেড়ে দিলাম, তুমি আবার আমাকে দেবে। আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য নিজের চক্ষু বন্ধ করে রাখে। নির্যাতনকারী নির্যাতন করেছে। সে তো পাথরের জবাব পাথর দ্বারা দিতে পারত। থাপ্পড়ের জবাব থাপ্পড় দ্বারা দিতে পারত। কিন্তু সে তা না করে ধৈর্যধারণ করেছে শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের আশায়। আল্লাহর নবী বলেন, যে ব্যক্তি এ রকম কর্মসম্পাদন করবে, এ রকম মুআমালা করবে আল্লাহ তা'আলা তার প্রতি স্বীয় নুসরত-সাহায্য দৃঢ় করবেন। দুনিয়া নির্যাতন করছে, আল্লাহ তা'আলা বলছেন, আমি তাকে সাহায্য করব। এটাই হলো রাসূলের সীরাত, যা দ্বারা দুনিয়ার বুকে শান্তি-শৃঙ্খলা সৃষ্টি হবে। পরস্পর ভালোবাসা ও মুহাব্বত সৃষ্টি হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, তুমি নির্যাতন সহ্য করো আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য, আল্লাহ তোমাকে সাহায্য করবেন। কেননা তুমি তো আল্লাহর জন্যই নির্যাতন সহ্য করছ।

আজ সেই মুসলমান কোথায়? নিজের দিকে একটু তাকিয়ে দেখুন। বর্তমান তো ধৈর্য বলতে কারো কাছে নেই। ধৈর্যশীলরা দুনিয়া থেকে চলে গেছেন। বর্তমানে তো একটি গালির পরিবর্তে ৫০টি গালি দেওয়া হয়। কাউকে গালি দেওয়া হলে সে উল্টো বাপ-দাদাকেসহ গালি দেয়। আল্লাহর নবীদের অনুসরণ-অনুকরণকারীগণ এ রকম ছিলেন না। তাঁরা এমন ছিলেন যে বড় বড় পাহাড়-পর্বত সমতুল্য মুসীবত আসত আর তাঁরা ধৈর্যধারণ করতেন শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য। এটা হলো প্রথম কথা।

দ্বিতীয় বিষয়ে বলা হয়েছে, আমার উম্মতের মধ্যে যিনি স্বীয় আত্মীয়তার বন্ধনকে অটুট রাখার লক্ষ্যে আত্মীয়স্বজনকে কিছু দান করবে, যাতে করে আত্মীয়তার বন্ধন শক্তিশালী ও দৃঢ় হয়। يـــريـــد بهـــا صـــلة যে ব্যক্তি আত্মীয়স্বজনদের সাথে মুহাব্বত করবে। তাদের জন্য নিজের মাল-সম্পদ ব্যয় করবে। দুনিয়ার কোনো লাভের জন্য নয় বরং আল্লাহপ্রদত্ত এই আত্মীয়তাকে দৃঢ়করণের লক্ষ্যে, যদিও স্বজন কর্তৃক মুআমালা উল্টো হয়, তবুও সে স্বজনদের সাথে ভালো আচরণ করে। তাদের জন্য ব্যয় করে, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, হে আবু বকর! এটা নিখুঁত সত্য কথা, যা আমি তোমাকে বলছি। যা তুমি ব্যয় করছ, আল্লাহ তা'আলা অনেক বৃদ্ধি করে তোমাকে দান করবেন। কেননা আল্লাহ তা'আলা আত্মীয় বানিয়েছেন আর তুমি সেটিকে দৃঢ় করছ, এটা আল্লাহর নিকট খুবই পছন্দনীয়।

তৃতীয় বিষয় হচ্ছে, কখনো কারো কাছে ভিক্ষা করা যাবে না। যে অন্যের নিকট হাত পাতে, ভিক্ষা করে, যাতে তার ধন-সম্পদ বৃদ্ধি পায়, রাসূল (সা.) বলেন, আল্লাহ তা'আলা তার অভাব-অনটনকে আরো বৃদ্ধি করে দেবেন। মরিয়া হয়ে ওঠে সম্পদ বৃদ্ধির জন্য, কখনো পেট ভরে না।

ভাইয়েরা আমার! এই শিক্ষা-দীক্ষার ওপর আমল করার নামই প্রকৃতপক্ষে

সীরাতে মুকাদ্দাসাহ। কিন্তু এটা কখন হবে? যখন মানুষের অন্তরে রাসূলের ভালোবাসা থাকবে। রাসূলের প্রতি যেমন ভালোবাসার দরকার ছিল, তেমন ভালোবাসা আমাদের অন্তরে নেই। রাসূলের প্রতি সাহাবাদের ভালোবাসা ছিল নজিরবিহীন। কিয়ামত পর্যন্ত এ রকম ভালোবাসার দৃষ্টান্ত আর কেউ দেখাতে পারবে না। আজ উম্মত রাসূলপ্রেমের দাবি করে একদিকে, অন্যদিকে আবার আল্লাহকে বাদ দিয়ে ভূতকে সিজদা করে, কবরকে সিজদা করে। এর অর্থ হলো এই, না আল্লাহর সাথে মুহাববত আছে, না রাসূল (সা.)-এর সাথে।

দৃষ্টান্তহীন মুহাব্বত ছিল সাহাবাদের মুহাব্বত। দু-একটি ঘটনা শুনিয়ে আমি বয়ান শেষ করে দেব।

হাদীস শরীফে এসেছে, ইবনে মাজাহ ইত্যাদি গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে রাসূল (সা.) অষ্টম হিজরীতে মদীনা মুনাওয়ারার প্রত্যাবর্তন করছিলেন।

পথিমধ্যে কোনো এক স্থানে বলেছেন, নামাযের সময় হয়ে গেছে, আযান দাও। আযান শুরু হয়ে গেছে। সেখানে শিশু-যুবকদের একটা দল ছিল। তারা আযানের ধ্বনির সাথে সাথে প্রতিধ্বনি করছিল। আযান শেষ হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন ওই বাচ্চাদের ধরে নিয়ে আসো। এই কথা শুনে সবাই তো পালিয়ে গেল। কিন্তু হযরত আবু মাহজুরা রয়ে গেলেন। তাঁকে রাসূল (সা.)-এর কাছে নিয়ে আসা হলো।

তখন রাসূল (সা.) বসা অবস্থায় ছিলেন। রাসূল (সা.) আবু মাহজুরাকে বললেন বলো- الله اكبر الله اكبر আবু মাহজুরা বললেন যে, আমি الله اكبر الله اكبر বলেছি। তিনি মানত যে ভূত তো শত শত; কিন্তু তন্মধ্যে সবচেয়ে বড় হলেন আল্লাহ। এখন রাসূল (সা.) বললেন বলো,

اشهد ان محمدا رسول الله

এই বাক্যটি তাঁর জন্য খুবই কঠিন এবং মুশকিল ছিল। তিনি الله اكبر তো মেনেছিলেন কিন্তু رسول الله শব্দটি তাঁর জন্য মারাত্মক ব্যাধি ছিল। আবু মাহজুরা একা এবং সাহাবাগণ হলেন ১০ হাজারের মতো। তাই তিনি

اشهد ان محمدا رسول الله

তো বললেন, কিন্তু খুবই ক্ষীণ আওয়াজে। রাসূল (সা.) আবার বললেন আরো উচ্চস্বরে বলো

اشهد ان محمدا رسول الله

এটা তো তাঁর জন্য পাহাড়সম ছিল। তিনি বলেন, আমার সবচেয়ে বেশি শত্রুতা ছিল মুহাম্মাদ (সা.)-এর সাথে। কারণ তিনি মানুষের কাছে শুনতেন যে মুহাম্মদ (সা.) বাপ-দাদার ধর্মের বিরোধিতা করেন। সেই কারণে তাঁর বড় শত্রুতা ছিল রাসূলের সাথে।

কিন্তু রাসূল (সা.)বললেন اشهد ان محمدارسول الله বলো। সেখানে অনেক লোকের সমাগম ছিল, তাই শঙ্কিতাবস্থায় নিচু আওয়াজে বাক্যটি উচ্চারণ করেছেন।

আবু মাহজুরা বলেন, অতঃপর তিনি আমাকে তাঁর কাছে বসালেন। এরপর তাঁর (রাসূলের) একটি হাত আমার সিনার ওপর আর অপর হাত আমার মাথার ওপর রাখলেন। আবু মাহজুরা বলেন, রাসূল (সা.)-এর হাত মুবারক আমার মাথা ও বক্ষ স্পর্শ করার সাথে সাথেই মনে হয়েছিল যে পৃথিবীতে এখন আমার সবচেয়ে বেশি ভালোবাসা ও মুহাব্বত মুহাম্মদ (সা.)-এর সাথে। অতঃপর রাসূল বললেন, উচ্চস্বরে বলো اشهد ان لااله الاالله , তখন আবু মাহজুরা সুউচ্চস্বরে বললেন اشهد ان لااله الاالله তারপর বললেন, উচ্চস্বরে বলো اشهد ان محمدارسول الله তখন তিনি সুউচ্চ আওয়াজে বললেন

اشهد ان لااله الاالله

এভাবেই জীবন পরিবর্তন হয়ে গেল।

হযরত আবু মাহজুরা রাসূল (সা.)-এর দরবারে আরজি পেশ করলেন যে হে আল্লাহর রাসূল (সা.)! আমাকে কোথাও মুয়াজ্জিন নিযুক্ত করে দিন। রাসূল বললেন–যাও, মক্কা বিজয় হয়েছে, মক্কাতে গিয়ে আযান দাও, তুমি মক্কার মুয়াজ্জিন। তিনি মক্কাতে আযান দিতেন। দুবার اشهد ان لااله الاالله নিচু আওয়াজে বলতেন এবং আর দুবার উঁচু আওয়াজে বলতেন। কিন্তু রাসূল (সা.)-এর প্রতি তাঁর মুহাব্বত কোন পর্যায়ে ছিল! তাঁর জীবনীতে এসেছে যে মৃত্যু পর্যন্ত তিনি মাথার চুল কাটেননি। তিনি বলতেন, আমার এই চুলে রাসূল (সা.)-এর মুবারক হাত রেখেছিলেন তাই এই চুলই আমার সাথে কবরে যাবে।

তিনি আরো বলেন, আমার চুল ছিল লম্বা লম্বা। রাসূল (সা.) কোনো কোনো সময় এগুলো দ্বারা খেলতেন। তখন তিনি যুবক ছিলেন। মাকে তিনি বলতেন, এই চুল কখনো কাটব না। কারণ এই চুলগুলো স্বয়ং রাসূল (সা.) স্পর্শ করেছেন, এগুলো আমার সাথে কবরে যাবে। এটাই ছিল রাসূলের প্রতি প্রকৃত ভালোবাসা ও মুহাব্বতের নিদর্শন।

মুসলমানরা এখন কোথায়? কবরে গিয়ে সিজদা করে আবার বলে রাসূলের সাথে মুহাববত। যদি সত্যিকারের রাসূলপ্রেমিকের দাবিদার হও তাহলে রাসূল (সা.) যা বলেছেন, সেটির ওপর আমল করো। এটার ওপর জীবন এবং এটার ওপর মৃত্যু। প্রকৃতপক্ষে এটাই হলো সীরাতে মুবারাকাহ।

হযরত বেলাল (রা.) আযান দিতেন। বলতেন,

الله اكبر الله اكبر اشهد ان لااله الاالله

اشهـد ان لاالــــه الاالـلــــه اشهـد ان مـحـمــدارسـول الـلـــه اشهـد ان محمدارسول الله

আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ (সা.) আল্লাহর রাসূল এবং পয়গম্বর। মুহাম্মদ (সা.) তাঁর সামনেই জীবিত অবস্থায় ছিলেন। যখন রাসূল (সা.) দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়ে গেলেন তখন হযরত বেলাল (রা.)ও বললেন, আমি এখন আর আযান দেব না। আমি এখন আযান দিতে পারব না। আমি কিভাবে বলব اشهـد ان مـحـمدا رسول الـلـه মুহাম্মদ (সা.) এখন আর আমার সামনে নেই। আযান ছেড়ে দিলেন। বিভিন্ন ধরনের বর্ণনা আছে। কিন্তু কেউ কেউ বলেন, মদীনা ছেড়ে চলে গেলেন সিরিয়ায়। এই বলে চলে গেলেন যে, এখন আমি মদীনায় থাকতে পারব না।

একদিন স্বপ্নে দেখলেন যে রাসূল (সা.) আগমন করে তাঁকে বলছেন,

مـاهـذه الـجـفـوـة يا بلال اما ان لك ان تزورنا

বেলাল! এটা কেমন জুলুম, তুমি দিন-রাত আমার সঙ্গেই থাকতে? আমাকে এখানে ছেড়ে চলে গেলে? আমার সাথে সাক্ষাতের জন্য কবে আসবে? এই স্বপ্ন দেখার পরই হযরত বেলাল (রা.) দিওয়ানা হয়ে গেলেন। ঘুম থেকে উঠে তাড়াতাড়ি মদীনা মুনাওয়ারায় চলে এলেন। সিরিয়া থেকে মদীনায় যখন পৌছলেন তখন সাহাবাদের স্মরণ হলো রাসূলের যুগ, অর্থাৎ সে যুগে হযরত বেলাল আযান দিতেন। চতুর্দিকে রব উঠল যে, جـــاء بـلال مـؤذن رسول الله আল্লাহর নবীর মুয়াজ্জিন বেলাল এসেছেন। হযরত বেলাল (রা.) পাগলের মতো কখনো হযরত আয়েশার রুমের দিকে যান, কখনো বাইরে আসেন। মদীনা মুনাওয়ারাতে ক্রন্দনমুখর এক পরিবেশ সৃষ্টি হয়ে গেল। তখন হযরত আবু বকর (রা.)-এর খেলাফত যুগ ছিল। সাহাবায়ে কেরাম হযরত বেলালকে আযান দিতে বললেন। কিন্তু হযরত বেলাল (রা.) বললেন, আমি আযান দিতে পারব না। আমার শক্তি নেই যে আমি اشهد ان محمدا رسول الله বলব, আজ রাসূলুল্লাহ (সা.) স্বীয় মুবারক কবরে শায়িত।

যখন লোকদের অনুরোধে কোনো কাজ হলো না তখন তাঁরা রাসূল (সা.)-এর দুই নাতি হযরত হাসান (রা.) ও হোসাইন (রা.)-কে বললেন আপনারা বেলালকে আযান দিতে বলুন। তাঁরা বলার পর হযরত বেলাল (রা.) বাধ্য হয়ে আযান শুরু করলেন।

লোকজন বললেন যে, তখন মদীনাবাসীদের ওই যুগের স্মরণ হয়ে গেল, যে যুগে হযরত বেলাল (রা.) আযান দিতেন এবং রাসূলুল্লাহ (সা.) সামনে থাকতেন। লোকজন কেঁদে কেঁদে ঘর থেকে বের হয়ে গেলেন। এমনকি মহিলারাও। হযরত বেলাল (রা.) اشهـد ان مـحـمـدا رسـول الـلـه পর্যন্ত পৌঁছলে বেহুঁশ হয়ে মাটিতে পড়ে গেলেন। আযানটি পরিপূর্ণ করতে পারেননি। এটাই ছিল প্রকৃত মুহাব্বতের নমুনা।

এখন কোথায় মুহাব্বত? আমরা তো মুহাব্বতের দাবি করি; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে যেরূপ মুহাব্বত হওয়া জরুরি, সেরূপ মুহাব্বত আমাদের অন্তরে নেই। এরূপ মুহাব্বত সৃষ্টির জন্য চেষ্টা করা দরকার। আল্লাহর নবীর প্রতি মুহাব্বত যতটুকু হবে, ততটুকু আল্লাহর রহমত মানুষের ওপর বর্ষিত হবে। মুহাববত এবং ভালোবাসার অর্থ হলো এই, নবীর শিক্ষাগুলো গ্রহণ করা, মুহাব্বতের অর্থ হচ্ছে তাঁর সুন্নাতসমূহকে নিজের জীবনের সাথে ফিট করা, মুহাববতের অর্থ হচ্ছে রাসূলুল্লাহর মতো সূরত এখতিয়ার করা। মুহাব্বতের অর্থ হচ্ছে রাসূলুল্লাহর মতো সীরাত এখতিয়ার করা। মুহাব্বতের অর্থ হচ্ছে আল্লাহর নবীর আদেশের অনুসরণ-অনুকরণ করা। তখনই তো মুহাববত মুহাব্বত হবে, অন্যথায় শুধু নামের মুহাব্বত, যেই মুহাব্বতের কোনো ভিত্তি নেই।

আমার ভাইগণ! নিজের ভেতরে এ রকম আগ্রহ ও আবেগ সৃষ্টির জন্য অনেক চেষ্টা করা দরকার। যাতে করে সঠিক অর্থে রাসূলের সাথে সম্পর্ক এবং মুহাববত সৃষ্টি হয়। সবাই যেন রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সঠিক ও পাকাপোক্ত একজন অনুসরণকারী হতে পারি। আমি তালেবে ইলমকেও বলব, সম্মেলনে অংশগ্রহণকারী প্রত্যেক ব্যক্তিকে বলব যে নিজের অন্তরে মুহাববত, অর্থাৎ রাসূলুল্লাহর খাঁটি অনুসরণ-অনুকরণের আগ্রহ, উৎসাহ ও উদ্দীপনা সৃষ্টি করা আবশ্যক। সবার জন্য আমার দু'আ থাকবে। বিশেষভাবে এই সম্মেলনের প্রতিষ্ঠাতা হযরত ফেদায়ে মিল্লাত (রহ.) এবং ফকীহে মিল্লাত মাওলানা আব্দুর রহমান (রহ.) আল্লাহ তা'আলা তাঁদের আত্মাকে সুখ-শান্তিতে রাখুন এবং তাঁদের মর্যাদা বৃদ্ধি করুন। তাঁর সন্তানাদিকে হেফাজত করুন। তাঁদের হিতাকাঙ্ক্ষীদের আল্লাহ নিজের পছন্দনীয় মাহবুব-মাকবুল করে নিন। এই সম্মেলনের সফলতা এবং তার প্রভাবকে উন্নততর করুন। আমাদের সবাইকে তাঁর এবং তাঁর হাবীব হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর সঠিক মুহাববত দান করুন। আমাদের দুনিয়াকেও ভালো করে দিন, আমাদের আখিরাতকেও ভালো করে দিন এবং রোজ হাশরে নবী করীম (সা.)-এর সুপারিশ নসিব করুন এবং স্বীয় জান্নাতে মাকাম দান করুন।

وصـلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا مـحـمـد والـه واصحابه اجمعين ـ أمين أمين

ভাষান্তর : কারী জসিম উদ্দীন কাসেমী

এপ্রিলফুল : ইতিহাসের সত্য-মিথ্যা

মাওলানা শরীফ উসমানী

সত্য জ্ঞান আহরণ, সত্যের সন্ধান ও সত্য বিশ্বাস লালনের তাগিদ সব ধর্ম ও দর্শনের। এ বিষয়ে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়েছে ইসলাম। কোনো কিছু যাচাই-বাছাই ও পরখ করার তাগিদ কোরআনে বারবার এসেছে। অজ্ঞাত বা অর্ধসত্য বিষয়ের অনুসরণ ইসলামে নিষিদ্ধ। ইরশাদ হয়েছে,

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا

অর্থ : 'যে বিষয়ে তোমার কোনো জ্ঞান নেই, তার অনুসরণ করো না। নিশ্চয়ই কান, চোখ ও অন্তর–এদের প্রতিটি সম্পর্কে কৈফিয়ত তলব করা হবে।' (সূরা : বনী ইসরায়েল, আয়াত : ৩৬)।

এই অজ্ঞাত ও অসত্য থেকে বেরিয়ে আসার একটি পথপরিক্রমা বাতলে দিয়েছে কোরআন। কোনো তথ্য পাওয়া গেলে সেটাকে পুঙ্খানুপুঙ্খ পরখ ও পরীক্ষা করার নির্দেশ দিয়েছে পবিত্র কোরআন। ইরশাদ হয়েছে,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ

অর্থ : 'হে ঈমানদাররা! যদি কোনো পাপাচারী তোমাদের কাছে কোনো বার্তা নিয়ে আসে, তাহলে তোমরা তা পরীক্ষা করে দেখবে। অন্যথায় অজ্ঞতাবশত তোমরা কোনো সম্প্রদায়কে ক্ষতিগ্রস্ত করে বসবে, পরে নিজেদের কৃতকর্মের জন্য তোমাদের অনুতপ্ত হতে হবে।' (সূরা : হুজুরাত, আয়াত : ৬)।

খবরের যাচাই-বাছাই ও সত্যের সন্ধানের কথা মহানবী (সা.) তাঁর পবিত্র হাদীসে বারবার বলেছেন। এক হাদীসে এসেছে,

كَفَى بِالْمَرْءِ كَذِبًا أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ

অর্থ : 'কোনো ব্যক্তি মিথ্যাবাদী হওয়ার জন্য এটাই যথেষ্ট যে সে যা শোনে, তা-ই বলে বেড়ায়।' (মুসলিম, হাদীস নম্বর : ৫)।

তথ্য যাচাইয়ের পদ্ধতি কী, এ বিষয়েও কোরআনে সুস্পষ্ট নির্দেশনা আছে। ইরশাদ হয়েছে,

وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ

অর্থ : '...তোমাদের মধ্যে দুজন ন্যায়পরায়ণ লোককে সাক্ষী রাখবে, আর তোমরা আল্লাহর জন্য সঠিক সাক্ষ্য দেবে...।' (সূরা : তালাক, আয়াত : ২)।

এ আয়াত থেকে জানা যায়, কোনো তথ্য পেলে অন্তত দুটি বিশ্বস্ত সূত্র থেকে তা যাচাই করতে হবে। আশা করা যায়, এতে সত্যের কাছাকাছি পৌঁছা সম্ভব। কোরআন ও হাদীসের এসব নির্দেশনা অনুসরণ করে পুঙ্খানুপুঙ্খ যাচাই করে হাদীস সংকলন করা হয়েছে। হাদীস এক অর্থে মহানবী (সা.)-এর সময়ের ইতিহাস। কিন্তু সাধারণ ইতিহাস ও হাদীসের মধ্যে রয়েছে বিস্তর ব্যবধান। এটা এ জন্য যে হাদীস সংকলিত হয়েছে কোরআন ও হাদীসের নির্দেশনা অনুসরণ করে। পৃথিবীর দুর্ভাগ্য যে ওহী অবতরণের সময়ের আগের ও পরের ইতিহাস শতভাগ বিশুদ্ধ উৎস থেকে বিশুদ্ধ পন্থায় সংরক্ষণ করার ব্যবস্থা করা হয়নি। অথচ ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নির্ধারণে মানুষের জন্য অতীত ইতিহাস থেকে মুখ ফেরানোর সুযোগ নেই। ইরশাদ হয়েছে,

لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ

অর্থ : 'তাদের (অতীতের লোকদের) জীবনবৃত্তান্তে বোধশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিদের জন্য শিক্ষা রয়েছে...।' (সূরা : ইউসুফ, আয়াত : ১১১)

উল্লিখিত কয়েকটি বাক্য আমরা এনেছি এপ্রিলফুলের ইতিহাসের সত্য-মিথ্যা বিশ্লেষণের লক্ষ্যে। পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুকরণের ফলে আমাদের সমাজে যেসব কুপ্রথার প্রচলন ঘটেছে, তার অন্যতম হলো প্রতিবছর ১ এপ্রিল 'এপ্রিলফুল' উদ্‌যাপন। এটি উদ্‌যাপনের নিয়ম হলো, এপ্রিলের প্রথম তারিখ মিথ্যা বাকচারিতার মাধ্যমে কাউকে ধোঁকা দেওয়া, ধোঁকা দিয়ে তাকে বোকা বানানো। ধোঁকা ও প্রতারণামূলক এ কাজ শুধু বৈধই মনে করা হয় না, ওই দিন এটাকে বিশেষ যোগ্যতা হিসেবে বিবেচনা করা হয়। যে যত আশ্চর্য পন্থায় অন্যকে প্রতারিত করতে পারবে, ওই দিন তাকে তত বেশি 'প্রতিভাবান' মনে করা হয়, তত বেশি লোকমুখে তার আলোচনা হতে থাকে। এপ্রিলফুল সম্পর্কে এতটুকু তথ্য সত্য। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ১ এপ্রিল প্রতারণার নানা ফাঁদ তৈরি করা হয়। মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ বাংলাদেশ এই অন্ধকার-উত্তাপ থেকে বাদ যায়নি।

পশ্চিমা দেশগুলো থেকে আসা এ প্রথার মূলে রয়েছে তিনটি বিষয়–
এক. মিথ্যা, দুই. ধোঁকা ও প্রতারণা এবং তিন. অন্যকে নিয়ে উপহাস করা।
এ তিনটি বিষয়কে ইসলাম অপরাধ হিসেবে বিবেচনা করে। মানবিক সুস্থ সুবোধও এগুলোকে অপরাধ জ্ঞান করে।
সত্য ও সঠিক কথা বলার তাগিদ দিয়ে কোরআন বলছে,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

অর্থ : 'হে মুমিনরা! আল্লাহকে ভয় করো এবং সঠিক কথা বলো।' (সূরা : আহজাব, আয়াত : ৭০)
ইসলামে সত্য কথা বলার প্রতি কতটুকু গুরুত্বারোপ করা হয়েছে, তার সম্পর্কে স্বচ্ছ বক্তব্য পাওয়া যায় হযরত মুআজ ইবনে জাবাল (রা.) থেকে বর্ণিত একটি হাদীসে। মহানবী (সা.) তাঁকে উপদেশচ্ছলে বলেছেন,

قُلِ الْحَقَّ ولو كان مراً

অর্থ : 'তুমি তিক্ত হলেও সত্য বলো।' (মুসনাদে আহমাদ : ৫/১৫৯; সহীহুল জামে', হাদীস নম্বর : ৩৭৬৯)
যুগে যুগে মহান আল্লাহ সত্যের মাধ্যমে মিথ্যার বেসাতিতে আঘাত হেনেছেন। সে সত্যের স্ফুলিঙ্গ মিথ্যার আস্ফালন নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে। মিথ্যার রাজপ্রাসাদে তীব্র কম্পন ধরিয়েছে। ইরশাদ হয়েছে,

بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ

অর্থ : 'বরং আমি সত্যের মাধ্যমে আঘাত হানি মিথ্যার ওপর। ফলে তা মিথ্যাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেয় এবং তৎক্ষণাৎ মিথ্যা নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়।' (সূরা : আম্বিয়া, আয়াত : ১৮)
মহান আল্লাহ কুদরতিভাবে পৃথিবীতে এ নিয়ম প্রবর্তন করেছেন যে সত্যের আগমনে বিলম্ব হলে মিথ্যা সেখানে জায়গা দখল করে নেয়। কিন্তু সত্য এসে গেলে একে একে মিথ্যার মঞ্চ ভেঙে চুরমার হয়ে যায়। ইরশাদ হয়েছে,

وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا

অর্থ : 'আর বলে দাও, সত্য এসেছে ও মিথ্যা বিলুপ্ত হয়েছে। মিথ্যা তো বিলুপ্ত হওয়ারই।' (সূরা : বনী ইসরায়েল, আয়াত : ৮১)
সত্য যখন হারিয়ে যায়, সুস্থ বোধ যখন বিনষ্ট হয়ে যায়, মানুষ তখন ধোঁকা, প্রতারণা ও ছলচাতুরীর আশ্রয় নিতে থাকে। সত্যবিমুখ এমন মানুষের জন্য মহানবী (সা.) এমন হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করেছেন যে এরা মুসলমানদের দলভুক্ত নয়। ইরশাদ হয়েছে,

مَن غشَّ فليس منى

অর্থ : 'যে প্রতারণা করে, সে আমার দলভুক্ত নয়।' (মুসলিম শরীফ, হাদীস নম্বর : ১০২)
প্রতারণা কপট লোকদের অভ্যাস। কোরআন ও হাদীসে এদের মুনাফিক হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। মহানবী (সা.) ইরশাদ করেছেন,

أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا، وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنَ النِّفَاقِ حَتَّى يَدَعَهَا :إِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ

অর্থ : 'যার মধ্যে চারটি স্বভাব আছে, সে প্রকৃত মুনাফিক। আর যার মধ্যে এ চারটি থেকে কোনো একটি স্বভাব আছে, সেটি ত্যাগ করা পর্যন্ত তার মধ্যে কপটতার একটি স্বভাব বিদ্যমান। ওই চার স্বভাব হলো, যখন তার কাছে আমানত রাখা হয়, তখন সে খেয়ানত করে, যখন সে কথা বলে, মিথ্যা বলে, যখন সে অঙ্গীকার করে, প্রতারণা করে, আর যখন সে বিবাদে জড়ায়, গালাগাল করে।' (বোখারী, হাদীস : ৩৪, মুসলিম, হাদীস : ৫৮)
প্রতারকরা চালাক প্রকৃতির হয়। তারা মনে করে, প্রতারণার মাধ্যমে অন্যকে ঠকানো যায়, অন্যের ওপর বিজয়ী হওয়া যায়। কিন্তু প্রকৃত সত্য এর বিপরীত। কোরআন বলছে,

يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ

অর্থ : 'তারা আল্লাহ ও মুমিনদের প্রতারিত করতে চায়। অথচ তারা যে নিজেদের ছাড়া অন্যদের প্রতারিত করে না, এটা তারা বোঝে না।' (সূরা : বাকারা, আয়াত : ৯)
অন্যকে প্রতারিত করে প্রতারকরা আত্মতৃপ্তি অনুভব করে। এই অনুভূতি তাদের মধ্যে অহংবোধ জাগ্রত করে। তখন তারা অন্যদের নিয়ে উপহাস ও বিদ্রূপ করতে থাকে। অন্যকে বিদ্রূপ করে ও বোকা বানিয়ে আত্যন্ত পুলকিত হওয়ার মানসিকতাকে ইসলাম পাপ হিসেবে চিহ্নিত করেছে। ইরশাদ হয়েছে,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَى أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

অর্থ : 'হে মুমিনরা! কোনো পুরুষ যেন অন্য পুরুষকে উপহাস না করে। কেননা যাকে উপহাস করা হয়, সে উপহাসকারীর চেয়ে উত্তম হতে পারে।

আর কোনো নারী যেন অন্য নারীকে উপহাস না করে। কেননা যাকে উপহাস করা হয়, সে উপহাসকারীণীর চেয়ে উত্তম হতে পারে। তোমরা একে-অন্যের প্রতি দোষারোপ কোরো না। তোমরা একে-অন্যকে মন্দ নামে ডেকো না। ঈমানের পর মন্দ নাম অতি মন্দ। (এসব করেও) যারা তাওবা করে না, তারাই জালিম।' (সূরা : হুজুরাত, আয়াত : ১১)

মিথ্যা, প্রতারণা ও বিদ্রূপ–এই তিনটি অপরাধ বিদ্যমান থাকায় ইসলাম পশ্চিমাদের আদলে ১ এপ্রিল উদ্‌যাপন অনুমোদন করে না।

মুসলমানদের দৃষ্টিতে এপ্রিলফুল শোকের স্মারক

এপ্রিলফুলের মতো এমন প্রতারণা প্রলুব্ধকারী উৎসব কিভাবে এল, এ নিয়ে বহুমুখী বক্তব্য পাওয়া যায়। অনেক মুসলমানদের দৃষ্টিতে এটি নির্মমতা ও শোকের স্মারক। স্প্যানিশ খ্রিস্টানরা মুসলিমদের সঙ্গে কী নির্মম আচরণ করেছিল, সেটা বোঝানোর জন্য একটি বিশেষ কাহিনি বর্ণনা করা হয়। সে কাহিনি হলো–

৭১১ সালের অক্টোবরে মুসলমানরা স্পেন জয় করে। ইসলামী শাসনের শাশ্বত সৌন্দর্য ও ন্যায়বিচারে মুগ্ধ হয়ে লাখ লাখ মানুষ ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করে। পাশাপাশি জ্ঞান-বিজ্ঞান, সাহিত্য-সংস্কৃতি ও শিল্প-সভ্যতার ক্ষেত্রে বিস্ময়কর উন্নতি সাধিত হতে থাকে। এদিকে ইউরোপীয় খ্রিস্টান রাজাদের চক্ষুশূলের কারণ হয়ে দাঁড়ায় মুসলমানদের এই অগ্রযাত্রা। ফলে ইউরোপীয় মাটি থেকে মুসলিম শাসনের উচ্ছেদ চিন্তায় তারা ব্যাকুল হয়ে ওঠে। অতঃপর আরগুনের ফার্ডিন্যান্ড ও কাস্তালোয়ার পর্তুগিজ রানি ইসাবেলা এই দুজন চরম মুসলিমবিদ্বেষী খ্রিস্টান নেতা পরস্পর বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়। তারা সর্বাত্মক শক্তি প্রয়োগ করে মুসলমানদের ওপর আঘাত হানার জন্য মরিয়া হয়ে ওঠে। তারা মুসলমানদের দুর্বলতার সুযোগ খুঁজতে থাকে। এমন সময় ১৪৮৩ সালে আবুল হাসানের পুত্র আবদুল্লাহ বোয়াবদিল খ্রিস্টান শহর লুসানা আক্রমণ করে পরাজিত ও বন্দি হন।

ফার্ডিন্যান্ড বন্দি বোয়াবদিলকে গ্রানাডা ধ্বংসের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে। একদল সৈন্য দিয়ে বোয়াবদিলকে প্রেরণ করে তারই পিতৃব্য আল-জাগালের বিরুদ্ধে। বিশ্বাসঘাতক বোয়াবদিল ফার্ডিন্যান্ডের ধূর্তামি বুঝতে পারেননি ও নিজেদের পতন নিজেদের দ্বারাই সংঘটিত হবে–এ কথা তখন তাঁর মনে জাগেনি। খ্রিস্টানরাও উপযুক্ত মওকা পেয়ে তাদের লক্ষ্যবস্তুর ওপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে পরিকল্পনা কার্যকর করতে থাকে। বোয়াবদিল গ্রানাডা আক্রমণ করলে আজ-জাগাল উপায়ন্তর না দেখে মুসলিম শক্তিকে টিকিয়ে রাখার মানসেই বোয়াবদিলকে প্রস্তাব দেন যে গ্রানাডা তাঁরা যুক্তভাবে শাসন করবেন ও সাধারণ শত্রুদের মোকাবেলার জন্য লড়াই করতে থাকবেন। কিন্তু আজ-জাগালের দেওয়া এ প্রস্তাব অযোগ্য ও হতভাগ্য বোয়াবদিল প্রত্যাখ্যান করেন। শুরু হয় উভয়ের মধ্যে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ।

ফার্ডিন্যান্ড ও রানি ইসাবেলা মুসলমানদের এই আত্মঘাতী গৃহযুদ্ধের সুযোগ লুফে নিয়ে গ্রামগঞ্জের নিরীহ মুসলিম নারী-পুরুষকে হত্যা করে গ্রামের পর গ্রাম জ্বালিয়ে দিতে দিতে ছুটে আসে শহরের দিকে। একপর্যায়ে রাজধানী গ্রানাডা অবরোধ করে। এতক্ষণে টনক নড়ে মুসলিম সেনাবাহিনীর। তারা গা ঝাড়া দিয়ে ওঠে। তাতে ভড়কে যায় সম্মিলিত খ্রিস্টান বাহিনী। সম্মুখ যুদ্ধে নির্ঘাত পরাজয় বুঝতে পেরে তারা ভিন্ন পথ অবলম্বন করে। তারা আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দেয় শহরের বাইরের সব শস্যখামার। বিশেষ করে শহরের খাদ্য সরবরাহের প্রধান উৎস 'ভেগা' উপত্যকা। ফলে অচিরেই দুর্ভিক্ষ নেমে আসে শহরে। খাদ্যাভাবে সেখানে হাহাকার দেখা দেয়। এই সুযোগে প্রতারক খ্রিস্টান রাজা ফার্ডিন্যান্ড ঘোষণা করে, 'মুসলমানরা যদি শহরের প্রধান ফটক খুলে দেয় ও নিরস্ত্র অবস্থায় মসজিদে আশ্রয় নেয়, তাহলে তাদের বিনা রক্তপাতে মুক্তি দেওয়া হবে। আর যারা খ্রিস্টান জাহাজগুলোতে আশ্রয় নেবে, তাদের অন্যান্য মুসলিম রাষ্ট্রে পাঠিয়ে দেওয়া হবে। অন্যথায় আমার হাতে তোমাদের প্রাণ বিসর্জন দিতে হবে।'

দুর্ভিক্ষতাড়িত অসহায় নারী-পুরুষ ও মাছুম বাচ্চাদের কচি মুখের দিকে তাকিয়ে মুসলিম নেতৃবৃন্দ সেদিন খ্রিস্টান নেতাদের আশ্বাসে বিশ্বাস করে শহরের প্রধান ফটক খুলে দেন। সবাইকে নিয়ে আল্লাহর ঘর মসজিদে আশ্রয় নেন। কেউ কেউ জাহাজগুলোতে আশ্রয় গ্রহণ করে। কিন্তু শহরে ঢুকে খ্রিস্টান বাহিনী নিরস্ত্র মুসলমানদের মসজিদে আটকিয়ে বাহির থেকে প্রতিটি মসজিদে তালা লাগিয়ে দেয়। অতঃপর একযোগে সব মসজিদে আগুন লাগিয়ে বর্বর উল্লাসে ফেটে পড়ে তারা। আর জাহাজগুলোকে মাঝ দরিয়ায় ডুবিয়ে দেওয়া হয়। কেউ উইপোকার মতো আগুনে পুড়ে ভস্ম হয়ে যায়, কারো হয় সলিল সমাধি। প্রজ্বলিত অগ্নিশিখায়

দগ্ধ ৭ লক্ষাধিক অসহায় মুসলিম নারী-পুরুষ ও শিশুদের আর্তচিৎকারে গ্রানাডার আকাশ-বাতাস যখন ভারী হয়ে ওঠে, তখন ফার্ডিন্যান্ড আনন্দের আতিশয্যে স্ত্রী ইসাবেলাকে জড়িয়ে ধরে তৃপ্তির হাসি হেসে বলতে থাকে, Oh! Muslim! How fool you are! অর্থাৎ : হে মুসলিম, তোমরা কত বোকা!

যেদিন এই হৃদয়বিদারক, মর্মান্তিক ও লোমহর্ষক ঘটনা ঘটেছিল, সে দিনটি ছিল ১৪৯২ সালের ১ এপ্রিল। সেদিন থেকেই খ্রিস্টানরা প্রতিবছর ১ এপ্রিল সাড়ম্বরে পালন করে আসছে April foolsO Day তথা 'এপ্রিলের বোকা দিবস' হিসেবে। মুসলমানদের বোকা বানানোর এই নিষ্ঠুর ধোঁকাবাজি স্মরণীয় করে রাখার উদ্দেশ্যে গোটা ইউরোপে প্রতিবছর ১ এপ্রিল 'এপ্রিলফুল' দিবস হিসেবে পালিত হয়।

এ ছাড়া আরেকটি ঘটনা বর্ণনা করা হয়ে থাকে। ঘটনাটি হলো, স্প্যানিশরা কিছুতেই বুঝে উঠতে পারছিল না, কেন মুসলিমরা পরাজিত হচ্ছে না। পরে তারা বুঝল যে তাদের মধ্যে তাকওয়া বা খোদাভীতি কাজ করে। তাই তারা সব সময় জয়ী হয়। এটা জেনে স্প্যানিশরা চালাকি করে সিগারেট আর অ্যালকোহল পানীয় পাঠায়। সেগুলো গ্রহণ করায় ধীরে ধীরে মুসলমানদের অন্তর থেকে আল্লাহভীতি চলে যেতে থাকে। অবশেষে ১ এপ্রিল তাদের পতন হয়।

এ ধরনের ঘটনা মুসলমানদের বিভিন্ন রচনায় ভরপুর। কিন্তু ইউরোপের ইতিহাসবিদদের বর্ণনার পাশাপাশি মুসলিম বিভিন্ন স্কলারদের অনুসন্ধানে এপ্রিলফুলের ভিন্ন প্রেক্ষাপট বেরিয়ে এসেছে। তাঁরা মনে করেন, স্পেনে মুসলমানদের পরাজয় ও তাদের ওপর অমানুষিক নির্যাতনের ঘটনা সত্য হলেও এপ্রিলফুলের ঘটনা সত্য নয়। বরং এ কাহিনির ৫৮ দিন আগেই ২ জানুয়ারি, ১৪৯২ রানি ইসাবেলার হাতে গ্রানাডার দখল চলে যায়!

A history of Medieval Spain গ্রন্থের তথ্য মতে, '১৪৯২ সালের ২ জানুয়ারি ইসাবেলা আর ফার্ডিন্যান্ড গ্রানাডায় প্রবেশ করে। তারা শান্তিপূর্ণভাবে সেদিন গ্রানাডার শাসক দ্বাদশ আবদুল্লাহ মুহাম্মাদের কাছ থেকে গ্রানাডার চাবি নেয়।'

আবদুল্লাহর সঙ্গে রানির চুক্তি হয়েছিল স্পেনে বসবাসরত মুসলমানদের ধর্মীয় স্বাধীনতা দেওয়া হবে। কিন্তু সে চুক্তি রক্ষিত হয়নি, আত্মসমর্পণ-পরবর্তী সময় থেকেই বিবিধ জুলুমপ্রক্রিয়া শুরু হয়। মুসলমানদের রক্ত নিয়ে হোলি খেলা শুরু হয় মূলত ১৫০৮ সালে, যখন 'ইনকুইজিশন' ঘোষণা করা হয়। অর্থাৎ ইহুদি ও মুসলমানদের হয়তো ক্যাথলিক হতে হবে, নয়তো স্পেন ছাড়তে হবে।

১৪৯৬ সালে ইসাবেলার সম্মতিতে আর্চবিশপ তালাভ্যারা আলহামরা ডিক্রি জারি করে। এই ডিক্রি অনুসারে স্পেনের ইহুদি ও মুসলিমদের হয়তো ক্যাথলিক খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ, নয়তো দেশ ত্যাগের নির্দেশ দেওয়া হয়। ১৫০২ সালে ইসাবেলা ইহুদি, মুসলিম ও অন্যান্য ক্রিশ্চানদের বাধ্যতামূলক ক্যাথলিক খ্রিস্টধর্মে ধর্মান্তরিত হওয়ার বা দেশত্যাগের আদেশ দিয়ে সরকারি ফরমান জারি করে।

গ্রানাডার পতনের পর প্রায় লক্ষাধিক মুসলমান মারা যায়, চার লাখ মুসলমান দেশত্যাগে বাধ্য হয় ও তিন লাখ মুসলমান ধর্মান্তরিত হতে বাধ্য হয়। ইহুদিদের ইতিহাস তো আরো করুণ। দুই লাখ ইহুদি মারা যায়, এক লাখ ইহুদি ধর্মান্তরিত হতে বাধ্য হয়, আর এক লাখ ইহুদি দেশত্যাগ করে। (সূত্র : Henry Kamen, Spain 1469 - 1714; A Society of Conflict)

এপ্রিলফুল : ইতিহাসের ইতিহাস

তাহলে এপ্রিলফুল দিবসের নেপথ্য ঘটনা কী? এ বিষয়ে ঐতিহাসিকদের বিভিন্ন অভিমত রয়েছে।

এক. কোনো কোনো লেখক বলেন, ফ্রান্সে সপ্তদশ শতাব্দীর আগে জানুয়ারি মাসের স্থলে এপ্রিল মাস থেকেই নববর্ষ শুরু হতো। রোমীয়রা নিজেদের দেবী ভেনাসের সঙ্গে যুক্ত করে এই মাসকে সম্মানিত মনে করত। ইউনানি ভাষায় 'ভেনাস' অর্থ হলো Aphro-dite। সম্ভবত এই ইউনানি নাম থেকেই এপ্রিল হিসেবে এ মাসের নামকরণ করা হয়েছে। (ব্রিটানিকা, পঞ্চদশ সংস্করণ-৮/২৯২)।

যারাই তখন নববর্ষ করতে চেয়েছে তাদের পিঠে পেপার ফিশ (Paper Fish) লাগিয়ে দিয়েছে। সেই তখন থেকে ভিক্টিমদের বলা হতো Poisson dOAvril বা এপ্রিল ফিশ। এমনকি এখন পর্যন্ত ফ্রান্সে এ নামেই তাদের ডাকা হয়, যারা এই দিনে বোকা বনে যায়।

সুতরাং কিছু কিছু ঐতিহাসিকের অভিমত হলো, যেহেতু ১ এপ্রিল নববর্ষের প্রথম তারিখ হিসেবে গণ্য হতো এবং এর সঙ্গে মূর্তিপূজাভিত্তিক সম্মানও জড়িত ছিল, সে কারণে এ দিবসকে তারা আনন্দ ও খুশির মাধ্যমে উদ্‌যাপন করত। সে খুশি উদ্‌যাপনের একটি অংশ ছিল হাসি, ঠাট্টা ও

উপহাস!

দুই. 'এনসাইক্লোপেডিয়া অব ব্রিটানিকা'য় এই প্রথার আরেকটি কারণ বর্ণনা করা হয়েছে। ২১ মার্চ থেকে ঋতুর পরিবর্তন শুরু হয়। এই পরিবর্তনকে কিছু লোক এভাবেই নিয়েছে যে, (মাআযাল্লাহ) স্রষ্টা আমাদের সঙ্গে বিদ্রূপ করে আমাদের বোকা বানাচ্ছে। সুতরাং সে সময় লোকেরাও একে অন্যকে বোকা বানাতে শুরু করে! (ব্রিটেনিকা-১/৪৯৬)

তিন. জার্মান থিওরি। ১৫৩০ সালের ১ এপ্রিল, জার্মানির অগসবারগ শহরে একটা আইনবিষয়ক মিটিং হওয়ার কথা ছিল। এই মিটিং এর ফলাফল নিয়ে অনেক মানুষ অনেক টাকা বাজিকরের কাছে জমা রাখে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ওই দিন মিটিং হয়নি। বাজিকর টাকা ফেরত দেয়নি। সব টাকা গচ্ছা যায়। এই বোকামি একটা উৎস হতে পারে এপ্রিলফুলের।

চার. হল্যান্ডের থিওরি। ১৫৭২ সালের ১ এপ্রিল। এদিন হল্যান্ডের ডেন ব্রিএল শহরটাকে লর্ড আল্ভার স্প্যানিশ শাসন থেকে মুক্ত করে ডাচ বিদ্রোহীরা। এই দিন তারা লর্ড আল্ভাকে পুরো বোকা বানিয়ে ছাড়ে। ১ এপ্রিলে আল্ভার বোকামি স্মরণ করে এপ্রিলফুল পালন করা হয়। মূলত এই ঘটনার পর অনেক জায়গায় বিদ্রোহ সোচ্চার হয় আর স্পেনের কাছ থেকে স্বাধীনতা পায় হল্যান্ড। (ইন্টারন্যাশনাল বিজনেস টাইমস, ৩-৩১-২০১২)

পাঁচ. 'এনসাইক্লোপেডিয়া অব ব্রিটানিকা' লারুস থেকে আরেকটি বর্ণনা উল্লেখ করেছে। তা হলো, ইহুদি ও খ্রিস্টানদের বর্ণনা মতে, ১ এপ্রিল ওই দিন, যেদিন রোমীয় ও ইহুদিদের পক্ষ থেকে হযরত ঈসা আলাইহিস সালামকে ঠাট্টা ও বিদ্রূপের নিশানা বানানো হয়েছিল। বর্তমানে প্রচলিত ইঞ্জিলে এ ঘটনা বিস্তারিত বর্ণনা করা হয়েছে। 'লুক'-এর ইঞ্জিলে বর্ণিত আছে : 'যে লোক তাকে (হযরত ঈসা আলাইহিস সালামকে) গ্রেপ্তার করেছিল, তাঁকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করতে থাকত, প্রহার করতে থাকত ও তাঁর চোখ বন্ধ করে মুখে থাপ্পড় মারতে থাকত। আর তাঁর কাছে জিজ্ঞেস করতে থাকত, ওহীর মাধ্যমে বলো তোমাকে কে মেরেছে? এমন বিদ্রূপ করে করে তাঁর বিরুদ্ধে তারা বহু কথা বলত।' (লুক, ২২:২৩-৬৫)

ইঞ্জিলেই এ কথা বর্ণনা করা হয়েছে, সর্বপ্রথম হযরত ঈসা (আ.)-কে ইহুদি নেতাদের আদালতে পেশ করা হয়। তারা তাঁকে পেলোটিসের আদালতে নিয়ে যায়। এরপর পেলোটিস তাঁকে হীরুডিসের আদালতে পাঠিয়ে দিল। এরপর হীরুডিস আবার ফয়সালার জন্য পেলোটিসেরই আদালতে পাঠায়। লারুসের কথা হলো, হযরত ঈসা আলাইহিস সালামকে এক আদালত থেকে অন্য আদালতে প্রেরণের উদ্দেশ্যই হলো ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা ও তাঁকে কষ্ট দেওয়া। যেহেতু এই ঘটনা ১ এপ্রিলেই সংঘটিত হয়েছিল, এ কারণে এপ্রিলফুল এ ধরনের লজ্জাজনক ঘটনার স্মৃতি বহন করে।

লারুস প্রমুখ একে অত্যন্ত নিশ্চয়তার সঙ্গে সঠিক বলেছেন এবং এর সপক্ষে বিভিন্ন দলিল দিয়েছেন। তবে হতে পারে, এ প্রথাটির প্রচলন ইহুদিরাই ঘটিয়েছে। এর উদ্দেশ্য হযরত ঈসা আলাইহিস সালামকে হেয়প্রতিপন্ন করা। কিন্তু অত্যন্ত আশ্চর্যের বিষয় হলো, যে প্রথা ইহুদিরা হযরত ঈসা আলাইহিস সালামকে উপহাস করার জন্য সৃষ্টি করেছে, তা কিভাবে খ্রিস্টানরা ঠাণ্ডা মাথায় গ্রহণ করে নিয়েছে? আশ্চর্যের বিষয় হলো, এ কাজকে খ্রিস্টানরা সম্মান ও মর্যাদাবান কাজ হিসেবেই ধরে নিয়েছে!

কলকাতা থেকে প্রকাশিত দৈনিক আনন্দবাজার এপ্রিলফুল উৎসবের সঙ্গে হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের 'হোলি' উৎসবের সঙ্গে মিল খুঁজে পেয়েছে। সেখানে রয়েছে, 'উত্তর ভারতে এপ্রিল মাসের ঠিক আগে হোলি উদ্‌যাপনও কিন্তু এই মজারই এক রকম উদ্‌যাপন। বন্ধুদের গায়ে রং গোলা ঠাণ্ডা জল ঢেলে তাদের বোকা বানানোও কিন্তু অনেকটা সেই রকমই ব্যাপার।' (সূত্র : বোকা বনবেন না, জেনে নিন 'এপ্রিলফুল'-এর ইতিহাস, আনন্দবাজার, ১ এপ্রিল, ২০১৭)। আশ্চর্য হলো, এপ্রিলফুলের মতো 'হোলি' খেলাও মুসলমানদের মধ্যে ক্রমেই বাড়ছে।

শুধু তা-ই নয়, মুসলমানরা ইতিমধ্যে 'হোলি' উৎসবে নিজেদের জীবন বিলিয়ে দিতেও শিখে গেছে। গত ১ মার্চ, ২০১৮ কয়েকটি পত্রিকার একটি খবরের শিরোনাম দেখুন : (১) 'হোলি উৎসবে ডেকে কলেজছাত্র খুন' (দৈনিক বাংলাদেশ প্রতিদিন)। (২) 'হলি উৎসবে সন্ত্রাসীদের ছুরিকাঘাতে কলেজছাত্র খুন।' (দৈনিক জনকণ্ঠ) (৩) 'রাজধানীতে হোলি উৎসবে কলেজছাত্র খুন।' (দৈনিক আলোকিত বাংলাদেশ)

এই খবরটি যাকে কেন্দ্র করে, তার নাম রওনক। সে একজন মুসলিম। এ বিষয়ে মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন। তবে প্রশ্ন থেকে যায়, বাংলাদেশ কোন দিকে যাচ্ছে?

মুবাল্লিগ ভাইদের প্রতি হযরতজির হেদায়াত-৪

মুফতী শরীফুল আজম

উলামায়ে দেওবন্দের নেগরানী

দাওয়াত ও তাবলীগের প্রচলিত পদ্ধতির গোড়াপত্তন যেভাবে উলামায়ে দেওবন্দের হাতে সম্পূর্ণ হয় ঠিক এর পৃষ্ঠপোষকতার ভূমিকায়ও ছিলেন উলামায়ে দেওবন্দ। সূচনালগ্ন থেকে আজ অবধি প্রায় শতবর্ষের কাছাকাছি সময়ব্যাপী উলামাদের নেগরানীতে চলে আসছে মুবারক এ মেহনত। এর পেছনে মূল ভূমিকা রেখেছেন প্রথম হযরতজি মাওলানা ইলিয়াস (রহ.)। তিনি নিজে একজন বিজ্ঞ আলেম ও সাহেবে নেসবত হওয়া সত্ত্বেও সর্বদা নিজেকে সমকালীন উলামায়ে দেওবন্দের নেগরানীতে পরিচালিত করতেন। তাঁদের পরামর্শ-মতামত ছাড়া এই মেহনতের মাঝে এক কদমও অগ্রসর হতেন না। নিজেকে এই নেগরানীর উর্ধ্বে মনে করতেন না।

হযরত মাওলানা ইলিয়াস (রহ.) উলামায়ে দেওবন্দের পরামর্শক্রমে দ্বীনি মাদরাসার ছাত্রদের দাওয়াতের মেহনতে সম্পৃক্ত করার কৌশল নির্ধারণ করেছিলেন। এসংক্রান্ত এক মজলিশে মশওয়ারা হযরতজির উদ্যোগে ৩ রবিউস সানী ১৩৬৩ হিজরী মোতাবেক ২৯ মার্চ ১৯৪৪ ইং রোজ বুধবার নিজামুদ্দিন মারকাজে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এতে উপস্থিত ছিলেন দারুল উলূম দেওবন্দের মুহতামীম ক্বারী তৈয়্যব সাহেব, প্রধান মুফতী হযরত মাওলানা মুফতী কেফায়াতুল্লাহ সাহেব, মাওলানা মুফতী শফী সাহেব, মাওলানা হাফেজ আব্দুল লতীফ সাহেব নাযেমে মাযাহেরুল উলূম সাহারানপুর মাদরাসা, মাওলানা এজাজ আলী সাহেব উস্তাদ দারুল উলূম দেওবন্দ, মাওলানা আব্দুল কাদের রায়পুরী সাহেব, শায়খুল হাদীস মাওলানা যাকারিয়া সাহেব। উক্ত পরামর্শে ফয়সালা হয় যে ১০ জন ছাত্র এবং দেওবন্দ ও সাহারানপুর থেকে একজন করে উস্তাদ নিয়ে জামা'আত বের করা হবে। এভাবে নিজামুদ্দিন তখন দেওবন্দ ও সাহারানপুরের উলামাদের পরামর্শ ও নেগরানীতে পরিচালিত হতো।

হযরত মাওলানা ইলিয়াস সাহেব (রহ.), হযরত মাওলানা মুফতী কেফায়াতুল্লাহ সাহেবসহ ওই যামানার বড় বড় আলেমের কাছে বারবার ছুটে গিয়েছেন দারুল উলূম দেওবন্দে উলামা ও মাশায়েখের খেদমতে হাজির হয়ে ৬টি গুণের কথা যখন প্রস্তাব করেন, তখন একটি গুণ ছিল, একরামুল উলামা। মুফতী কেফায়াতুল্লাহ সাহেব দেখেশুনে বললেন, আপনি একরামুর উলামার পরিবর্তে একরামুল মুসলিমিন রাখেন। এতে বেশি ফায়দা হবে, হযরত মাওলানা ইলিয়াস সাহেব (রহ.) আনন্দচিত্তে মেনে নিলেন তখন হযরত মুফতী সাহেব নিজ হাতে 'একরামুল উলামা' কেটে 'একরামুল মুসলিমিন' রেখে দিলেন। (সূত্র : রাহে ইতিদাল-৪০)

হযরত মাওলানা ইলিয়াস সাহেব (রহ.) জীবনের শেষের দিকে দাওয়াত ও তাবলীগের মেহনতের পুরো নকশা পেশ করার জন্য হযরত মাওলানা মুফতী কেফায়েতুল্লাহ সাহেবকে অনেক তোষামোদ ও খোশামোদ করে তিন দিনের জন্য নিজামুদ্দিন মারকাজে নিয়ে আসেন। তিন দিন পর্যন্ত হযরত মুফতী সাহেবকে কাজের পুরো তরতিব দেখানোর চেষ্টা করেন। এরপর মুফতী সাহেবকে নিয়ে আপন হুজরায় প্রবেশ করেন এবং দরজা বন্ধ করে দিয়ে আবেগের সাথে একখানা তলোয়ার মুফতী সাহেবের হাতে দিয়ে বলেন, হযরত! দাওয়াত ও তাবলীগের মেহনতের এই যে পদ্ধতি আমি আপনার সামনে পেশ করলাম, যদি এর মধ্যে ভ্রষ্টতা থাকে তাহলে এই তলোয়ার দিয়ে আমার গর্দান কেটে ফেলুন! যাতে উম্মত ধ্বংস থেকে বেঁচে যায়, আর যদি এই মেহনত পদ্ধতি আপনার কাছে হক্ব মনে হয়, তাহলে আমাকে এ কাজের ব্যাপারে সহযোগিতা ও দু'আ করবেন। হযরত মুফতী কেফায়েতুল্লাহ সাহেব (রহ.) বললেন, যত দিন উলামা ও মাশায়েখের দিকনির্দেশনা নিয়ে, তাদের আদব-এহতেরাম ঠিক রেখে এই মেহনত করবে এবং তাদেরকে ইলমী মেহনত থেকে সরানোর চেষ্টা করবে না, বরং তাদের মেহনতের ব্যস্ততার ভেতরেই কিছু সময় তাদের থেকে নেওয়ার চেষ্টা করবে এবং তাদের দু'আ নিয়ে এ কাজ করতে থাকবে, তত দিন এ কাজ ও মেহনত ঠিকভাবে চলতে থাকবে এবং উন্নতি হতে থাকবে। হযরত মাওলানা ইলিয়াস সাহেব (রহ.) হযরত মুফতী সাহেবকে আশ্বস্ত করলেন যে, হযরত! এভাবেই (অর্থাৎ আপনার বাতলানো পদ্ধতিতে) কাজ চলতে থাকবে। ইনশাআল্লাহ (রাহে ইতিদাল-৪১)

সুতরাং দাওয়াত ও তাবলীগের মেহনতে উলামা-মাশায়েখের দিকনির্দেশনা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। অতএব দাওয়াত ও তাবলীগের সাথে সম্পর্কিত কোনো ব্যক্তি যদি উলামা ও মাশায়েখ থেকে নিজেকে বা নিজেদের বিচ্ছিন্ন রাখে বা রাখার চেষ্টা করে এই ভেবে যে তারা তো তাবলীগী নন, সালওয়ালা উলামা নন, তাহলে এটা সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় হবে এবং এটার দ্বারা নিজেদের মধ্যে রূহানী দুর্বলতাই বাড়বে, মেহনতে রূহানী শক্তি কমতে থাকবে। উলামা ও মাশায়েখ তো দ্বীনি ব্যস্ততা নিয়েই আছেন, দ্বীনের মেহনত করে যাচ্ছেন, পাশাপাশি যদি তাঁরা কোনো সময় সুযোগ পেয়ে এই পদ্ধতিতে কিছু সময় লাগাতে পারেন, তাহলে তো ভালো। না হলে, তাঁদের দু'আ এবং দিকনির্দেশনাই আমাদের এই মেহনতের মূল সম্পদ। উলামা ও মাশায়েখকে তাবলীগওয়ালা বানানো আমাদের কাজ নয়। এই কাজ করতে গিয়ে যদি উসূলের পাবন্দী না করে, তাদের আদব-এহতেরামের খেলাফ কাজ করা হয়, তাহলে তাদের সাথে দূরত্বই সৃষ্টি হবে, যা দাওয়াত ও তাবলীগের মেহনতের জন্য খুবই অশনিসংকেত বলে আমাদের মুরব্বিরা মনে করেন। (রাহে ইতিদাল-৪১)

ভুল সংশোধনের ফিকির :

হাদীস শরীফে বলা হয়েছে যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে বিনয়ী হবে আল্লাহ তা'আলা তার মর্যাদা বৃদ্ধি করে দেবেন। হযরতজি মাওলানা ইলিয়াস (রহ.) ছিলেন তেমনি একজন বিনয়ী। নিজের ভুল নিয়ে সদা শঙ্কিত থাকতেন। যে কারো নজরে তাঁর কোনো ভুলত্রুটি ধরা পড়লে যেন সে তা সুধরে দেয় এই কামনাই করতেন হযরতজি (রহ.)। তিনি বলেন,

حضرت فاروق اعظمؓ حضرت ابو عبیدہؓ اور حضرت معاذؓ سے فرماتے تھے کہ میں تمہاری نگرانی سے مستغنی نہیں ہوں، میں بھی آپ لوگوں سے یہی کہتا ہوں کہ میرے احوال پر نظر رکھئے اور جو بات ٹو کنے کی ہو اس پر ٹو کئے (ملفوظات ۱۲۲)

অর্থ : হযরত ফারুকে আজম (রা.), হযরত আবু উবায়দা (রা.) ও হযরত মুয়াজ (রা.)-কে বলতেন যে "আমি আপনাদের নেগরানীর মুখাপেক্ষী।" তদ্রূপ আমিও আপনাদেরকে বলছি যে দয়া করে আমার অবস্থার ওপর নজর রাখুন এবং সংশোধন করার মতো যে সকল বিষয় আছে তার সংশোধন করুন। (মালফুজাত-১২২)

মাশওয়ারাভিত্তিক মেহনত :

দাওয়াতের এই মোবারক মেহনতের মেরুদণ্ড বলা যায় মাশওয়ারার মতো একটি সুন্নাতকে। এই কাজের ভিত্তি রাখা হয়েছে মূলত মাশওয়ারার ওপর। কেউ যাতে নিজের কথা এককভাবে চালিয়ে দিতে না পারে, আর এটাই কোনো ভালো কাজ নষ্ট হওয়ার চোরা দরজা–তার জন্য মাশওয়ারার এত গুরুত্ব। প্রথম হযরতজি মাওলানা ইলিয়াস (রহ.) সমকালীন উলামা-মাশায়েখের মাশওয়ারার ভিত্তিতে আমীর হিসেবে কাজ চালিয়ে গেছেন। তারপর দ্বিতীয় হযরতজি মাওলানা ইউসুফ (রহ.) উলামা-মাশায়েখের মাশওয়ারার মাধ্যমে আমীর নিযুক্ত হয়েছেন। এরপর তৃতীয় হযরতজি মাওলানা এনামুল হাসান (রহ.) একই পদ্ধতিতে আমীর নিযুক্ত হয়েছেন। কেউই নিজের একক সিদ্ধান্তে আমীর দাবি করে লোকদের মানতে বাধ্য করেননি। অতএব মাশওয়ারার মূলনীতি উপেক্ষিত হলে দাওয়াতের কাজ ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

হযরতজি মাওলানা ইলিয়াস (রহ.) বলেন,

ہمارے اس کام میں اخلاص اور صدق دلی کیساتھ اجتماعیت اور شوری بینھم کی (یعنی مل جل کر اور باہمی مشورہ سے کام کرنے کی) بڑی ضرورت ہے اور اس کے بغیر برا خطرہ ہے (ملفوظات ۱۲۲)

অর্থ : আমাদের এই কাজের মাঝে এখলাস, সততার সাথে সাথে একতাবদ্ধ থাকা এবং মাশওয়ারার মাধ্যমে মিলেমিশে কাজ করার গুরুত্ব অপরিসীম। আর তা না হলে বড় আশঙ্কা ও বিপদ আছে। (মালফুজাত, পৃ :-১৪৪)

দাওয়াত ও তাবলীগের প্রধান পৃষ্ঠপোষক হযরত শায়খ যাকারিয়া (রহ.), হযরতজি মাওলানা ইউসুফ (রহ.)-এর ইন্তেকালের পর তাবলীগের বিভিন্ন জিম্মাদার সাথিদের পত্র মারফত মাশওয়ারার গুরুত্ব বোঝাতে গিয়ে লেখেন,

اہم بات یہ ہے کہ آپ کے تعلقات کا بہت زیادہ اہتمام رکھیں شیطان کا سب سے بڑا حربہ جو دینی کاموں میں رکاوٹ کا سبب ہوا کرتا ہے وہ آپس کا اختلاف ہے، جماعتی کاموں میں اختلاف طبیعتوں اور رائے کا ہوا ہی کرتا ہے، آدمی کو یہ نہ سمجھنا چاہئے کہ جو میری رائے ہے وہ تو حق اور جو دوسروں کی رائے ہے وہ بالکل غلط ہے، دوسروں کی رائے کا بھی لحاظ رکھنا چاہئے (سوانح ۱/۲۸۹)

পরস্পর জোড়মিলের প্রতি লক্ষ রাখবে। শয়তানের সবচেয়ে বড় হাতিয়ার, যা দ্বীনের কাজে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে, তা হচ্ছে পরস্পরের মতানৈক্য। দলবদ্ধ যেকোনো কাজে মত ও পছন্দের

তারতম্য হওয়াটা স্বাভাবিক। নিজের মতকে শতভাগ সঠিক আর অন্যের মত বা রায়কে শতভাগ ভুল মনে করা অনুচিত। অন্যের মতামতের প্রতি শ্রদ্ধা থাকা চাই। (সাওয়ানেহ ১/২৮৯)

বড় হযরতজি মাওলানা ইলিয়াস (রহ.) বলেন,

مشورہ بڑی چیز ہے اللہ تعالی کا وعدہ ہے کہ جب تم مشورہ کے لیے اللہ تعالی پر اعتماد کر کے جم کر بیٹھو تو اٹھنے سے پہلے تم کو رشد کی توفیق مل جائے گی۔

মাশওয়ারা খুবই গুরুত্ববহ, আল্লাহ তা'আলার ওয়াদা রয়েছে, যখন তোমরা মাশওয়ারার জন্য আল্লাহর ওপর ভরসা করে একত্রে বসবে, তো উঠার পূর্বে সঠিক সিদ্ধান্তের তাওফীক মিলে যাবে। (মালফুযাত-১৩২)

হযরতজী মাওলানা এনামুল হাসান (রহ.) বলেন,

کام کرنے والا اپنے جذبات کو قربانی کرتا رہے اور مشورے کے تابع رہے تو چلتا رہے گا ورنہ خطرہ ہے کہ ہٹ جائے گا، دین کے بارے میں دبنے سے دروازے کھلتے ہیں، ایسے موقع پر نفس یوں کہتا ہے کہ ناک نیچی ہوگئی، حالانکہ جو دبتا ہے اللہ تعالی اسکو بلند کرتے ہیں، اور جس کو اللہ تعالی بلند کرتے ہیں اس کو کوئی نیچا نہیں کرسکتا۔

এই কাজের সম্পৃক্ত সাথিরা নিজের পছন্দকে কোরবানী করে মাশওয়ারার অনুগত হয়ে থাকলে সামনে অগ্রসর হতে থাকবে, অন্যথায় লাইনচ্যুত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। দ্বীনের ব্যাপারে নিচু হয়ে থাকলে মর্তবা বৃদ্ধি পায়, নফস বলে যে, নাক কাটা গেল। আর বাস্তব হলো যে নিচু হয়ে থাকে আল্লাহ তা'আলা তাকে উঁচু করে দেন। আর আল্লাহ তা'আলা যাকে মর্যাদা দান করেন কেউ তাকে নিচু করতে পারে না।

হযরতজি (রহ.) আরো বলেন,

اپنے آپ کو مشورے کے مطابق رکھنا ہے، اجتماعت اور بندھن رہے توڑ نہ ہو، ہمارا کام یہ ہے کہ مان کر چلیں۔

নিজেকে মাশওয়ারার অনুগত করা, জোড়মিল বজায় রাখা এবং তোড় সৃষ্টি হতে না দেওয়া, আমাদের কাজ হচ্ছে মেনে চলা। (সা. মা. এ.-৩/১৩৪)

জোড়মিল মুহব্বত :

হযরতজি মাওলানা ইউসুফ (রহ.) মুসলমানদের ঐক্যের প্রতি গুরুত্বারোপ করে বলেন, হুজুর (সা.) এবং সাহাবায়ে কেরাম (রা.) নিজেদের সর্বস্ব বিলীন করে মুসলমানদের এক উম্মত হিসেবে তৈরি করে গেছেন। মুসলমান যদি এখনো এক উম্মত হিসেবে ঐক্যবদ্ধ থাকে তবে দুনিয়ার সকল শক্তি একত্রিত হয়ে তাদের একটি পশমও বাঁকা করতে পারবে না। উম্মতের জোড়মিলের পথে যবানকে সবচেয়ে বড় অন্তরায় হিসেবে চিহ্নিত করে তিনি কলেন,

امت کے بنانے اور بگاڑنے میں جوڑنے اور توڑنے میں سب سے زیادہ دخل زبان کا ہوتا ہے، یہ زبان دلوں کو جوڑتی بھی ہے اور پھاڑتی بھی ہے، زبان سے ایک بات غلط اور فسا کی نکل جاتی ہے اور اس پر لاٹھی چل جاتی ہے اور پورا فساد کھڑا ہو جاتا ہے، اور ایک ہی بات جوڑ پیدا کر دیتی ہے، اس لیے سب سے زیادہ ضرورت ہے کہ زبان پر قابو ہو، اور یہ جب ہوسکتا ہے جب بندہ ہر وقت اس کا خیال رکھے کہ خدا ہر وقت ہر جگہ اس کے ساتھ ہے اور اس کی ہر بات سن رہا ہے (سوانح مولانا انعام الحسن ۱/۱۵۱)

উম্মতকে বানানো আর বিগড়ানো, জোড় আর তোড় সৃষ্টি করার ব্যাপারে মুখ্য ভূমিকা হচ্ছে যবানের। এই যবান দিলকে জুড়েও ফাড়েও। মুখ থেকে একটা ভুল কথা বা ঝগড়ার কথা বের হয়ে যায় আর সেটাকে কেন্দ্র করে লাঠিসোঁটা পর্যন্ত গড়ায় এবং বিশাল ফেতনা সৃষ্টি হয়। আবার একটি কথাই সকল ঝগড়া মিটিয়ে জোড়মিল, মুহব্বত সৃষ্টি করে দেয়। তাই যবানের নিয়ন্ত্রণ সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন। আর এটা তখনই সম্ভব হবে, যখন বান্দা এ কথা মনে করবে যে আল্লাহ সর্বদা সব জায়গায় তার সাথে রয়েছেন এবং তার প্রতিটি কথা শুনতেছেন।

হযরতজি মাওলানা এনামুল হাসান (রহ.) বলেন,

اجتماع قلوب تقریروں اور تدبیروں سے نہیں ہوتا بلکہ یہ تو دوسروں کی خوبیاں دیکھنے اور اپنے عیوب دیکھنے سے ہوتا ہے خوبیاں دیکھنے کے لیے دوسرے کی ذات ہو اور عیوب دیکھنے کے لیے اپنی ذات ہو جو اس طرح چلے گا وہ ایک سراپا خوبی بن جائے گا۔

জোড়মিল, মুহব্বত বক্তৃতা বা তদবির দ্বারা সৃষ্টি হয় না। বরং এটা তো অন্যের গুণাগুণ দেখা আর নিজের দোষত্রুটি দেখার মাধ্যমে হয়ে থাকে। গুণ অপর ভাইয়ের মাঝে খুঁজতে হবে আর দোষ নিজের মাঝে খুঁজতে হবে। এভাবে কেউ যদি চলতে পারে তবে সে একদিন আপাদমস্তক গুণে ভরপুর হয়ে যাবে। (সা. মা. এ-৩/১৮৯)

আমীর হওয়ার দাবি :

তিনি আরো বলেন,

دین کی جڑیں کاٹنے والی چیز انتشار ہے، میں امیر بنوں، میری بات چلے، میں اگرچہ حقیر فقیر لیکن میری بات کیوں نہیں مانی گئی، یہ سب انتشار پیدا کرنے والی چیزیں ہیں، شیطان کا

سب سے بڑا ہتھیار انتشار اور افتراق ہے
اجتماعت جتنی ہوگی کام کی جڑیں اتنی ہی
مضبوط ہونگی (سوانح ۳/۱۹۱)

বিভেদ দ্বীনের শিকড় কেটে দেয়। আমি আমীর হব, আমার কথাই চলবে। অথবা আমি যদিও ছোট হই বা ফকীর হই কিন্তু আমার কথা শোনা হলো না কেন? এমন মনোভাবই বিভেদ সৃষ্টির উৎস। শয়তানের সবচেয়ে বড় হাতিয়ার হচ্ছে বিভেদ ও দলাদলি। জোড়মিল যত বেশি হবে কাজের গোড়া ততই মজবুত হবে। (সা. মা. এ-৩/১৯১)

ব্যক্তিনির্ভর নয়, উসূলনির্ভর :

হযরত মাওলানা ইলিয়াস সাহেব (রহ.)-এর আন্তরিক আকাঙ্ক্ষা ছিল যে দাওয়াত ও তাবলীগের মেহনতের এ আন্দোলনে এমন কোনো উপাদান যেন যুক্ত না হয়, যার কারণে মানুষ এটাকে তার ব্যক্তিসত্তা কিংবা তার সমকালের সাথে সম্পৃক্ত মনে করে বসতে পারে। কেননা তাহলে পরবর্তীতে সাধারণ মুসলমানগণ এ কাজের মেহনত মোজাহাদার হিম্মত ও সাহস হারিয়ে ফেলবে। এ কারণে কোনো পর্যায়েই তার নামে দাওয়াতের পরিচিতি হোক, এটা তিনি পছন্দ করতেন না। (দ্বীনি দাওয়াত) কিছুদিন পূর্বেও দাওয়াত ও তাবলীগের মেহনত করনেওয়ালা মুরব্বিগণ হায়াত থাকা অবস্থায় নিজেদের নাম নিয়ে কোনো কথাবার্তা চালানো পছন্দ করতেন না। জীবিত থাকা অবস্থায় কেউ মুরব্বিদের কথা বলতে চাইলে তারা চাইতেন এভাবে বলা হোক, আমাদের বড়রা বলেন, কিংবা আমাদের বড়রা এটা চান। তাদের মনশা-ইচ্ছা এই ধরনের। মুরব্বিদের ইন্তেকালের পর তাদের নাম নিয়ে বলা হতো–বড় হযরতজি বলেছেন, কিংবা হযরত মাওলানা ইউসুফ সাহেব (রহ.) বলেছেন, শায়খুল হাদীস সাহেব (রহ.) বলে গেছেন ইত্যাদি। কিন্তু বর্তমানে খুবই উদ্বেগের ব্যাপার যে আমরা নাম ধরে ধরে খুব বেশি কথা চালানোর চেষ্টা করছি। এটা আমাদের আকাবীরদের পছন্দের খেলাফ। কেননা দাওয়াত ও তাবলীগের মেহনত কোনো শখসিয়াতের (ব্যক্তিবিশেষের) ওপর নির্ভর কোনো কাজ নয়। তাই কোনো ব্যক্তি যত বড়ই হোক, কাজকে তার দিকে নেসবত না করে বরং তাকে কাজের দিকে নেসবত করা চাই।

আমাদের বড় হযরতগণের মতে আরেকটি বিষয় খেয়াল করা দরকার, কোনো মসজিদ বা মারকাজে যদি আমীর সাহেব থাকেন, তাহলে তাঁর কদর করা, তাঁকে মেনে চলা উচিত। আর যদি শূরা থাকে তাহলে সব শূরাকেই কদর করা উচিত। যদি খোদপছন্দির কারণে কোনো মারকাজে বা মসজিদে কোনো সাথি বেশি কথা বলতে পারার কারণে বা কাজের ব্যাপারে বেশি ফিকির করতে পারার কারণে নিজের অবস্থান পাকাপোক্ত করতে চায়, তাহলে আল্লাহ মাফ করুন এই মানসিকতার কারণে এখলাস নষ্ট হয়ে যাবে। আর এখলাস নষ্ট হয়ে গেলে কাজের রূহ বের হয়ে যাবে এবং মেহনতের নাম পড়ে থাকে। সুতরাং এখলাসের জন্য উসূলের পাবন্দী অত্যন্ত জরুরি।

এ জন্য আমরা যারা মেহনতের সাথে জড়িত আমাদেরও খোঁজখবর নেওয়া দরকার, কোন মারকাজে কতজন শূরা সদস্য আছেন এবং কে কে শূরা সদস্য আছেন? কাজের ব্যাপারে কোনো কিছু সিদ্ধান্ত নিতে হলে ব্যক্তিগতভাবে শূরা সদস্যকে জিজ্ঞাসা না করে আহলে শূরাকে জিজ্ঞেস করা উচিত। এমন যেন না হয়, শূরার মধ্যে তিনিই সবচেয়ে বেশি ক্ষমতাবান। সুতরাং তাঁকে জিজ্ঞেস করলেই হবে। তিনি যেটা বলবেন, সেটাই হবে। আমাদের বুঝতে হবে তিনি আমাদের শূরার একজন আমীর বা জিম্মাদার।

আর শূরার কারো কাছ থেকে এমন সিদ্ধান্ত চাওয়া হলে তাঁরও উচিত একক সিদ্ধান্ত না দিয়ে এ কথা বলে দেওয়া যে, ভাই আমি তো একজন শূরা সদস্য মাত্র। আমাকে এককভাবে সিদ্ধান্তের জন্য না জিজ্ঞাসা করে বরং আহলে শূরাকে জিজ্ঞেস করুন। কেবল তাহলেই দাওয়াতের কাজের নাহাজ (পন্থা) ঠিক থাকবে। আর যদি কোনো শূরা সদস্য দেখেন যে সবাই যখন আমার দিকেই বেশি মায়েল ঝোঁকা সুতরাং আমিও এই সুযোগটি কাজে লাগিয়ে অন্যদের পাশ কাটিয়ে যেতে থাকি। অচিরেই আমার মর্যাদা মানুষের অন্তরে বৃদ্ধি পেতে থাকবে। তাহলে দ্বীনের মেহনতের নামে এই ব্যক্তি দুনিয়ায় গ্রেফতার থাকবেন। কারণ দুনিয়া শুধু টাকা-পয়সা আর ধন-দৌলতের নাম নয়। বরং মর্যাদার মোহ বা প্রভুত্বলিপ্সাও দুনিয়ার অন্তর্ভুক্ত। বরং উলামা হযরতগণ বলেন, হোব্বে জাহ বা প্রভুত্বলিপ্সা হোব্বে মাল থেকেও মারাত্মক। মালের মহব্বত দিলের থেকে বের হয়ে যাওয়ার কারণে সে নিজেকে দুনিয়াদার হিসেবে গণ্য করে না। বরং যারা মালের মহব্বতে আক্রান্ত সে তাদেরকে নিজের থেকে কম মর্যাদার মনে করে ফলশ্রুতিতে মনের অজান্তে সে কিবির বা অহংকারের ব্যধিতেও আক্রান্ত হয়। এই ধরনের পদস্খলনের ব্যাপারে এর কোনোটিই তার বিভিন্ন ধরনের মোজাকারা এবং বয়ানে ধরা

পড়ে না। অথচ প্রভুত্বলিপ্সা বা মর্যাদার মোহ এবং অহংকার এমন দুটি মারাত্মক রোগ, যা থেকে নিজেকে সুস্থ করার আগে তার অন্য অনেক উপকারী জিনিসই তার জন্য তেমন কোনো ফায়দা দেয় না।

দ্বীনের এই মোবারক মেহনত কোনো ব্যক্তি নির্ভর নয়, বরং এর তারাক্কী এখলাস এবং উসূলের ওপর জমে থাকার মাঝে নিহিত। হযরতজি মাওলানা এনামুল হাসান (রহ.) ব্যক্তিনির্ভরতার ক্ষতি উল্লেখ করে বলেন,

جب آدمی کی نگاہ اپنی ذات پر ہوتی ہے تو کام نہ ہونے پر مایوسی آتی ہے اور اگر خدا پر نگاہ ہوتی ہے تو کام نہ ہونے پر رجوع الی اللہ بڑھتا ہے، کام کے نہج کے صحیح ہونے کا فکر بڑھتا ہے، اور کام ہونے پر اپنے اندر خدا کا شکر پیدا ہوتا ہے۔ (سوانح ۳/۱۷۹)

যদি মানুষ নিজের ওপর নির্ভর করে মেহনত করে তবে কাজ না হলে নিরাশ হয়ে যায়। আর যদি আল্লাহর ওপর ভরসা থাকে তাহলে কাজ না হলে আল্লাহর দিকে রুজু হয়, মনোযোগী হয় এবং সঠিক পদ্ধতিতে কাজ করার ফিকির বৃদ্ধি পায়। আর কাজ উদ্ধার হলে আল্লাহর শোকর পয়দা হয়। (সা. মা. এ-৩/১৭৯)

ফেতনার সময় কাজে মনোযোগ :

যেকোনো ফেতনা-ফ্যাসাদের সময় মেহনতকে এবং সাথিদেরকে ফেতনা থেকে বাঁচানোর জন্য মনোযোগের সাথে উসূল মেনে কাজে লেগে থাকার হেদায়াত প্রদান করে হযরতজি মাওলানা এনামুল হাসান (রহ.) বলেন,

سادگی کے ساتھ اپنے کو کام میں جمائے رکھیں گے تو ہماری بھی فتنوں سے حفاظت ہوگی اور کام کی بھی حفاظت ہوگی، فتنوں سے بچتے ہوئے یکسوئی کے ساتھ ان اعمال کو کرتے رہیں گے تو فتنوں سے بچتے رہیں گے ورنہ تھوڑے سے فتنے کی طرف اگر جھانکیں گے تو فتنہ ہمیں اپنی طرف گھسیٹ لے گا (سوانح ۳/۱۷۹)

সাদাসিধাভাবে নিজেকে কাজে জমাতে পারলে আমাদের নিজেদেরও ফেতনা থেকে হেফাজত হবে এবং এই কাজও নিরাপদ থাকবে। ফেতনা থেকে দূরে থেকে মনোযোগের সাথে এ সকল আমলে জুড়তে থাকলে ফেতনা থেকে বাঁচতে থাকবেন। অন্যথায় ফেতনার দিকে সামান্য উঁকি মারলে ফেতনা আমাদেরকে টেনেহিঁচড়ে নিজের দিকে নিয়ে ছাড়বে। (সা. মা. এ-৩/১৭৯)

রাজনীতি থেকে দূরে থাকা :

তাবলীগের এই মেহনতের সাথে কারো সংঘর্ষ না হওয়া এবং বিশ্বের সকল দেশে গ্রহণযোগ্য হওয়ার পেছনে যে দর্শনটি কার্যকর ভূমিকা রেখে আসছে তা হচ্ছে নিজেদের রাজনীতি থেকে দূরে রেখে রাজনৈতিক ব্যক্তিদের দ্বীনের দাওয়াত দিয়ে দ্বীনের ওপর ওঠানোর চেষ্টা করা। হযরতজি মাওলানা ইলিয়াস (রহ.)-এর দূরদর্শিতা ও ইলমী গভীরতার ফলে এই মুবারক মেহনতকে সব ধরনের বাধা-বিপত্তির উর্ধ্বে রেখে সামনে এগিয়ে নেওয়া সম্ভব হয়েছে। তাবলীগের ছয় নম্বরকে এমনভাবে চয়ন করা হয়েছে দেশ বিভেদ ও সরকারের পালাবদল একে প্রভাবিত করতে পারেনি। বরং যেকোনো দেশে যেকোনো পরিবেশে নিজের স্বকীয়তা বজায় রেখে ইসলামের দাওয়াত ঘরে ঘরে পৌঁছে দিতে সক্ষম হয়েছে এই ছয় উসূল।

বড় হযরতজি মাওলানা ইলিয়াস (রহ.) রাজনীতির পরিবর্তে দাওয়াতের মেহনত চালিয়ে যাওয়ার প্রবক্তা ছিলেন। এর বিপরীত পদক্ষেপকে তিনি ইসলামও মুসলমানদের জন্য ক্ষতিকর মনে করতেন। তিনি বলতেন,

اس امت سے صدیوں سے سیاست کی قوت واہلیت سایب ہوچکی ہے، اب مدتوں صبر وضبط کے ساتھ دعوت کے اصول پر کام کرنے کی ضرورت ہے، اس کے بعد مسلمانوں میں نظم واطاعت کی قابلیت اور قانون کی پابندی میں کام کرنے کی قوت پیدا ہوگی۔

বিগত কয়েক শতাব্দী থেকে এই উম্মতের রাজনৈতিক শক্তি-সামর্থ্য হাতছাড়া হয়ে গেছে। এখন কিছুকাল ধৈর্যধারণকরত দাওয়াতের মূলনীতির ওপর কাজ করে যাওয়া দরকার। এরপর মুসলমানদের মাঝে শৃঙ্খলা ও আনুগত্যের যোগ্যতা এবং নিয়ম-কানুন মেনে কাজ করার সামর্থ্য সৃষ্টি হবে। (সা. মা. এ-৩/২৭২)

বড় হযরতজি (রহ.)-এর রাজনৈতিক দর্শন হচ্ছে দ্বীনদার লোকদেরকে ক্ষমতায় বসানোর চেষ্টার পরিবর্তে ক্ষমতাসীনদের কাছে দ্বীন পৌঁছানোর চেষ্টা করা। যাতে করে তারা দ্বীনের প্রতি আগ্রহী হয়ে আখেরাতকে সামনে রেখে রাষ্ট্র পরিচালনা করে। এই দর্শনকে অনুসরণ করে দ্বিতীয় হযরতজি মাওলানা ইউসুফ (রহ.) এবং তৃতীয় হযরতজি মাওলানা এনামুল হাসান (রহ.) সারা জীবন রাজনীতি থেকে নিজেদের দূরে রেখে রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গ এবং প্রশাসনের কর্মকর্তাদের দ্বীনের দাওয়াত দিতে থাকেন। আল্লাহর পথে এবং সত্যের পথে তাদের আহ্বান করতে থাকেন।

মুজাদ্দেদী তরীকা :

সত্য ধর্ম ইসলামের হেফাজত ও এর প্রচার-প্রসারকল্পে তিন হযরতজিই যে পথ ও পন্থা অবলম্বন করেছিলেন তা হচ্ছে মূলত মুজাদ্দেদে আলফে সানী (রহ.)-এর দেখানো পথ ও পন্থা। এ ব্যাপারে হযরতজি মাওলানা ইউসুফ (রহ.) বলেন,

دین کا کام ایک تو ہے شاہ اسماعیل صاحب شہیدؒ کے طرز کا، لیکن اس میں دیکھو کہ ان کے ساتھ جو مجمع تھا وہ اولیاء کی صفات سے بھی آگے بڑھا تھا، صحابۂ کرام سے مشابہت پائی جاتی تھی اور پھر ابتداء ہوئی بدعات اور فسق وفجور کے خلاف کوشش سے اور انتہاء کی سکھوں کے خلاف جہاد سے، آج اس وقت امت میں اس طرز کے کام کی استعداد نہیں ہے۔

দ্বীনের কাজের একটা হচ্ছে শাহ ইসমাঈল শহীদ (রহ.)-এর পদ্ধতি। কিন্তু লক্ষ করে দেখুন সেখানে তাঁর সাথে যেই বাহিনী ছিল তারা আউলিয়াদের স্তরের চেয়ে উর্ধ্বে ছিল। সাহাবায়ে কেরাম (রা.)-দের সাদৃশ্য পাওয়া যেত। এরপর বিদ'আত ও বিভিন্ন নাফরমানীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে যাত্রা শুরু হলো আর শেষ হলো শিখদের বিরুদ্ধে জিহাদের মাধ্যমে। আজ উম্মতের মাঝে এই পদ্ধতিতে কাজ করার যোগ্যতা ও সামর্থ্য নেই।

এরপর তিনি বলেন,

دوسرا کام ہے دین کا حضرت مجدد الف ثانی کے طرز پر کہ نیچے سے اصلاح کرتے آؤ، اور اگر نیچے اصلاح ہو جائے تو کم از کم درجہ یہ ہوگا کہ اوپر والوں کا شر انہیں میں محدود ہو جائے گا، اور آخر وہ بھی ترک شر پر مجبور ہوں گے، اگر حکومت سے شر آیا ہے تو عوام میں جن میں کوشش کر سکتے ہو ان کو شر سے خیر میں ڈال دو تو حکومت کا شر بھی ختم ہو جائے گا، جس طرح مجدد الف ثانیؒ نے حکومت کے علاوہ اس کے نیچے کو درست کرنا شروع کیا، آخر میں حکومت کا بھی شر ختم ہو گیا اور ان کی کوشش کے طفیل اکبر اور جہانگیر کی اولاد میں عالمگیر جیسے خادم شریعت پیدا ہوئے، ہمارا یہ کار تبلیغ حضرت مجددؒ کے طرز پر شر کو روکنا ہے اور خیر کی طرف موڑنا ہے۔

দ্বীনের কাজের আরেকটি পদ্ধতি হচ্ছে মুজাদ্দেদে আলফেসানী (রহ.)-এর পদ্ধতি, অর্থাৎ নিচের থেকে এসলাহ বা সংশোধন করতে করতে আসা। যদি নিম্ন শ্রেণীর এসলাহ বা সংশোধন হয়ে যায় তবে ন্যূনতম ফায়দা এই হবে যে ওপরওয়ালাদের খারাবি তাদের মাঝেই সীমাবদ্ধ হয়ে পড়বে। শেষে তারাও খারাবি পরিত্যাগ করতে বাধ্য হবে। যদি রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে কোনো খারাবি আসে তবে জনগণের মধ্য হতে যাদের ওপর চেষ্টা করা সম্ভব হয় তাদের ওই খারাবি থেকে ফিরিয়ে ভালোর দিকে নিয়ে আসা। তাহলে হুকুমতের খারাবিও খতম হয়ে যাবে। যেভাবে মুজাদ্দেদে আলফেসানী (রহ.) সরকারের পরিবর্তে তার নিচের স্তরে শুদ্ধি আন্দোলন আরম্ভ করেছিলেন। ফলে সরকারের খারাবিও একদিন দূর হয়ে গিয়েছিল। তাঁরই প্রচেষ্টায় বাদশাহ আকবর এবং বাদশাহ জাহাঙ্গীরের ঔরসে বাদশাহ আলমগীরের মতো শরীয়তের খাদেম জন্ম নিয়েছে। আমাদের এই তাবলীগের কাজ হচ্ছে মুজাদ্দেদ (রহ.)-এর পদ্ধতি অনুসারে খারাবিকে প্রতিহত করা এবং মঙ্গলের দিকে ফিরিয়ে আনা। (সা. মা. এ-৩/২৭৬)

শায়খ বান্নাকে পরামর্শ :

হযরতজি মাওলানা ইউসুফ (রহ.) মিসরের একসময়ের আলোড়ন সৃষ্টিকারী সংগঠন আল-ইখওয়ানের প্রধান শায়খ হাসান আল-বান্নাকে পরামর্শ দিয়ে ছিলেন যে নিজেদের কর্মসূচিকে সম্পূর্ণ রাজনীতিমুক্ত রাখুন। সরকারের সাথে কোনো প্রকার সংঘর্ষে জড়াবেন না। কিন্তু তিনি এই পরামর্শ গ্রহণ করেননি। এরপর ওই সংগঠনের পরিণতির ইতিহাস সকলের জানা আছে। মাওলানা সাইয়্যেদ আবুল হাসান নদভী (রহ.) কারওয়ানে জিন্দেগী নামক গ্রন্থে লেখেন, যদি ইখওয়ান কিছুকাল রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে না জড়িয়ে দাওয়াত ও ইসলাহের কাজ পুরোদমে চালিয়ে যেত, তবে গোটা আরব বিশ্বে ইসলামী ইনকিলাব সৃষ্টি হয়ে যেত এবং এক নতুন জীবন ফিরে আসত। নির্ভরযোগ্য সূত্রে আমি জানতে পেরেছি যে শায়খ বান্না জীবনের শেষ মুহূর্তে সময়ের পূর্বে এই রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হওয়ার জন্য বহু আফসোস করেছেন। তিনি পুনরায় দাওয়াতের মেহনতের সুযোগ পাওয়ার তীব্র আকাঙ্ক্ষা ও প্রত্যাশা ব্যক্ত করতেন। (সা. মা. এ-৩/২৯৭)

সরকারের সমর্থন বা বিরোধিতা না করা

হযরতজি মাওলানা এনামুল হাসান (রহ.) তাঁর দীর্ঘ অভিজ্ঞতা ও আল্লাহপ্রদত্ত অন্তর্দৃষ্টির মাধ্যমে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন যে দুনিয়াব্যাপী যত দল বা সংগঠন দ্বীনের মেহনত করে যাচ্ছে তাদের উচিত সরকারের সমর্থন বা বিরোধিতা থেকে দূরে থেকে কাজ চালিয়ে যাওয়া এবং সংঘর্ষ বা বিরোধ সৃষ্টির কোনো ইস্যু তৈরি হতে না দেওয়া। (সা. মা. এ-৩/২৯৬)

ভিন্ন চোখে কওমী মাদরাসা-১৬

মাওলানা কাসেম শরীফ

মদীনায় ইসলামী শিক্ষার সূচনা ও বিকাশ : হিজরী প্রথম সনে মহানবী (সা.) আনসার ও মুহাজিরদের সহযোগিতায় মসজিদে নববী প্রতিষ্ঠা করেন। ওই মসজিদের সঙ্গে পৃথক দুটি কক্ষ নির্মাণ করা হয়। এর মধ্যে একটিকে মহানবী (সা.) আবাসগৃহ হিসেবে ব্যবহার করতেন। আর অন্যটিকে শিক্ষা নিকেতন হিসেবে ব্যবহার করতেন। ইতিহাসে এই শিক্ষা নিকেতনকে 'মাদরাসা-ই সুফফা' বলা হয়ে থাকে। এ মাদরাসা ছিল আবাসিক। এর মধ্যে স্থানীয় গরিব, দুস্থ, এতিম ও সহায়-সম্বলহীন মুহাজির ও তাঁদের সন্তানদের থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। এখানে যাঁরা থাকতেন, তাঁদের 'আসহাবে সুফফা' নামে আখ্যায়িত করা হয়। 'সুফফা'র এ মাদরাসাটিই মদীনার প্রথম স্বয়ংসম্পূর্ণ আনুষ্ঠানিক শিক্ষাকেন্দ্র। এখানে পবিত্র কোরআন ছিল প্রধান পাঠ্যপুস্তক। কোরআনের ব্যাখ্যা, হাদীস ও তাজবিদ (কোরআন পাঠের নিয়মনীতি) ইত্যাদির পাশাপাশি ইসলাম ধর্মীয় বিধি-বিধান এখানে শিক্ষা দেওয়া হতো। এটাই ছিল তখন ইসলামী শিক্ষার প্রধান ও প্রথম কেন্দ্র। ইতিহাসবিদরা এটাকে জনশিক্ষা কেন্দ্র হিসেবেও আখ্যায়িত করেছেন। এ শিক্ষাকেন্দ্রর আবাসিক ছাত্রদের ব্যয়ভার নগরীর বিত্তবানরা ব্যবস্থা করতেন। আবার অনেকে নিজেই নিজের ব্যয়ভার নির্বাহ করতেন। [মজিদ আলী খান, শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সা), বাংলা অনূদিত (ঢাকা : ইফাবা, ২০০৫), পৃষ্ঠা ১২৪]

তবে 'মাদরাসা-ই সুফফা'র আগে মদীনায় তিনটি উপানুষ্ঠানিক শিক্ষাকেন্দ্রের অস্তিত্ব পাওয়া যায়। ওই তিন প্রতিষ্ঠান হলো–(১) মসজিদে বনি যুরায়েখ শিক্ষাকেন্দ্র। এটি হিজরতের আগে মদীনায় প্রথম মাদরাসা। মদীনার প্রাণকেন্দ্র 'কালব' নামক স্থানে এ মসজিদ-কাম মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করা হয়। হযরত রাফে বিন মালেক আনসারী (রা.) এ মসজিদের ইমাম ও মুয়াল্লিম (শিক্ষক) ছিলেন। [মোহাম্মদ আকরম খাঁ, মোস্তফা চরিত (ঢাকা : ঝিনুক পুস্তিকা, ১৯৭৫), পৃ. ৪৫১]

(২) মসজিদে কুবা। মদীনা থেকে ছয় মাইল উত্তরে কুবা নামক স্থানে এ মসজিদ অবস্থিত। হিজরতের সময় মহানবী (সা.) মদীনায় এসে সর্বপ্রথম এ স্থানে ১৪ দিন অবস্থান করেন। এখানে তিনি একটি মসজিদ প্রতিষ্ঠা করেন। এর মধ্যে এক শুক্রবার তিনি জুমু'আর নামাযে ইমামতি করেন। নওমুসলিমসহ অগ্রবর্তী মুহাজিররা সর্বপ্রথম এখানে অবস্থান করে। এখানেও উপানুষ্ঠানিক ইসলামী শিক্ষা চালু হয়। হযরত সালেম (রা.) ও হযরত আবু হোযায়ফা (রা.) নামের দুজন সাহাবী এই মসজিদকেন্দ্রিক শিক্ষা নিকেতনে শিক্ষকতা করতেন।

[ড. আবদুস সাত্তার, বাংলাদেশে মাদরাসা শিক্ষা ও সমাজ জীবনে তার প্রভাব (ঢাকা : ইফাবা, ২০০৪), পৃ .৪৬]

(৩) নাকিউল খাজামাত শিক্ষাকেন্দ্র। মদীনা থেকে ৯ মাইল দক্ষিণে 'নাকিউল খাজামাত' নামক স্থানে হযরত আস'আদ বিন ইউয়ারা (রা.)-এর বাড়িতে একটি উপানুষ্ঠানিক মাদরাসা প্রতিষ্ঠিত হয়। মদীনার বিখ্যাত আউস ও খাযরাজ গোত্রের মধ্যে যাঁরা আকাবার শপথের পর ইসলাম গ্রহণ করেছেন, তাঁরা এখানে নামায আদায় করতেন ও ইসলামী বিধি-বিধান সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করতেন। হযরত মুসআব বিন উমাইর (রা.) এ মাদরাসার শিক্ষক ছিলেন। মহানবী (সা.) তাঁকে 'মুয়াল্লিমুন মাশহুর' (বিখ্যাত শিক্ষক) উপাধিতে ভূষিত করেন। (প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৮)

এ ছাড়া আরো দু-একটি প্রথম দিকের শিক্ষাকেন্দ্রর কথা ইতিহাসে পাওয়া যায়। যেমন–গামিম মাদরাসা।

মক্কা থেকে মদীনার পথে গামিম নামক স্থানে অনানুষ্ঠানিক শিক্ষাকেন্দ্রের কথা স্মরণীয়। বরিদ বিন হাসিব (রা.)সহ একদল লোক এসে এখানে মহানবী (সা.)-এর কাছে ইসলাম গ্রহণ করেন। মহানবী (সা.) তাঁদের নিয়ে ইশার নামায আদায় করেন ও সূরা মারইয়ামের প্রাথমিক আয়াতগুলো তাঁদের শিক্ষা দেন। (প্রাগুক্ত, পৃ. ৪)

দ্বিতীয় হিজরীতে (৬২৩ খ্রিস্টাব্দে) মাকরামাহ ইবনে নাওফেল (রা.) নামক জনৈক আনসারের গৃহে 'দারুল কাররাহ' নামে একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ছিল। এ প্রতিষ্ঠানটি ছিল আবাসিক ধরনের। ওই সাহাবী নিজ গৃহে থেকে জ্ঞানার্জন করতেন।

আল্লাহর রাসূল (সা.) মসজিদুন নববীতে অবস্থান করে সাহাবীদের নামায

কোরআন ও হাদীস শরীফ শিক্ষা দিতেন। কোরআন শরীফের আয়াত মুখস্থ করার জন্য তিনি তিনবার আবৃত্তি করতেন। কোরআন শিক্ষা করা ছাড়াও সাহাবীরা ধর্মীয় বিধান (rituals), কারুময় হস্তলিপি (calliography), বংশ ইতিহাস (geneology), ঘোড় দৌড়, ও তীর নিক্ষেপ শিক্ষা করতেন। এভাবে একযোগে ধর্মীয় ও জাগতিক শিক্ষার প্রচলন ঘটিয়েছেন মহানবী (সা.)। মক্কা, মদীনা, সিরিয়া ও বিভিন্ন

অঞ্চলের সাহাবী কোরআন-হাদীসের জ্ঞান আহরণের জন্য তাঁর কাছে আসতেন। রাসূলে করীম (সা.)-এর জীবদ্দশায় ৯টি মসজিদ মদীনায় ছিল। এসব মসজিদে মুসলিম শিশুরা শিক্ষা গ্রহণের জন্য সমবেত হতো। আধুনিক যুগের শিক্ষাদান পদ্ধতির মতো তখন ভর্তি পরীক্ষা ও বেতনের দ্বারা শিক্ষার দ্বার সংকুচিত ছিল না। মসজিদ ছিল তখন একটি উন্মুক্ত বিদ্যালয়, যা হতে বর্তমানে Open University -এর ধারণা লাভ করেছে। শিক্ষাদানের বহু প্রজ্ঞাময় ও জ্ঞানী সাহাবী তখন ছিলেন শিক্ষকতায় নিবেদিত। ছাত্ররা তাঁদের ঘিরে রাখত মৌচাকের মৌমাছির মতো।

ঐতিহাসিক খোদা বক্স Islamic Civilization গ্রন্থে ওই আমলের মসজিদের বৈশিষ্ট্য ও ব্যবহার সম্পর্কে লিখেছেন, "For the Muslims the mosque does not bear the same exclusive character as does a church for the Christians. It is not merely a place of worship. The Muslim indeed honours the mosque but he does not hesitate to use it for any laudable purpose".

রাসূল (সা.) কর্তৃক বিদ্যাপীঠ হিসেবে মসজিদের এই সর্বজনীন প্রশংসনীয় ব্যবহারই পরে শিক্ষার গণমুখী প্রসার ও সম্প্রসারণে ব্যাপক ভূমিকা পালন করেছে। ঐতিহাসিক ইয়াকুবীর মতে, বাগদাদে ৩০ হাজার মসজিদ শিক্ষাদানের জন্য ব্যবহৃত হতো। বড় মসজিদগুলোতে পাঠ্যতালিকা ভাগ করা ছিল। শিক্ষকরা সে পাঠ্যতালিকা অনুযায়ী বিশেষ পাঠ্যসূচির ওপর বক্তৃতা দিতেন। পরিব্রাজক নাসির খসরুর মতে, (একাদশ শতাব্দীতে) মিসরের রাজধানী কায়রোর মসজিদে প্রত্যহ প্রায় ৫ হাজার লোক 'দ্বীনে ইলম' (ধর্মীয় জ্ঞান) আহরণের জন্য সমবেত হতো। সাম্প্রতিককালের মিসরের জামে আযহার, দিল্লির জামেয়া মিল্লিয়া ও দেওবন্দ মাদরাসা মসজিদভিত্তিক শিক্ষারই উত্তর ফসল।

ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে মুসলমানরা যখনই কোনো দেশ জয় করেছেন, তখনই তাঁরা সে দেশে তাঁদের বাসস্থানসংলগ্ন স্থানে মসজিদ নির্মাণ করেছেন। এ ঐতিহ্য থেকেই শতাব্দীর পাদমূলে এসে ভাগ্যাহত ও বিভ্রান্ত মুসলিম মিল্লাত মসজিদকে কেন্দ্র করে পুনরায় ইসলামী শিক্ষাকে উজ্জীবিত ও প্রতিষ্ঠা করার জন্য চেতনা লাভ করছে। দাওয়াত ও তাবলীগের কার্যক্রম সম্ভবত সে স্মৃতি ও পদ্ধতি বহন ও ধারণ করছে।

মহানবী (সা.)-এর ছাত্রদের পরিচয়

মহানবী (সা.) মাত্র ২৩ বছরের নবুয়তীজীবনে যে শিক্ষা বিপ্লব ঘটিয়েছেন, শিক্ষা ক্ষেত্রে এমন বিপ্লব আর কেউ দেখাতে পারেনি। অনানুষ্ঠানিক, উপানুষ্ঠানিক ও আনুষ্ঠানিকভাবে তিনি যে শিক্ষাব্যবস্থা চালু করেছেন, অতি অল্প কয়েক বছরে সেখান থেকে লক্ষাধিক ছাত্র-ছাত্রী ওহীর জ্ঞানে সিক্ত হয়।

সাইয়েদ সুলায়মান নদভী (রহ.) তাঁর 'পয়গামে মুহাম্মদী' নামক গ্রন্থে লিখেছেন, '...নবুয়ত বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বশেষ শিক্ষায়তনটি দেখুন। সেখানে একই সময়ে এক লাখেরও বেশি ছাত্র দেখতে পাবেন। তাঁর প্রত্যেকটি ছাত্রের নাম, পরিচয়, অবস্থা, জীবনচরিত, শিক্ষা ও অনুশীলনের ফলাফল, প্রতিটি বিষয় ইসলামের ইতিহাসের পাতায় লিপিবদ্ধ আছে।' আধুনিক বিশ্বের শিক্ষাব্যবস্থা ছাত্রদের জীবনবৃত্তান্ত ততটুকু রাখতে সক্ষম হয়নি, যতটুকু আল্লাহর রাসূল (সা.)-এর ছাত্রদের 'ইতিহাস বৃত্তান্ত' বর্তমানে সংরক্ষিত হয়ে আছে। হযরত উমর (রা.) থেকে হযরত বিলাল (রা.) পর্যন্ত খলিফা, ক্রীতদাস, আরব, অনারব, প্রভাবশালী, নিরীহ, সবাই এক কাতারে সমমর্যাদায় আল্লাহর রাসূল (সা.)-এর কাছে বিদ্যাশিক্ষা লাভের সমান সুযোগ লাভ করেছিল। সুলায়মান নদভীর বর্ণনায় রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর শিক্ষায়তনে সর্বজনীনতার এ দিকটি সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। এর মধ্যে প্রবেশাধিকার লাভের জন্য বর্ণ ও আকৃতি, দেশ, রাষ্ট্র, জাতি, বংশ, ভাষা ও উচ্চারণ ভঙ্গিমার কোনো প্রাচীরই ছিল না, বরং ওই সময়ে দুনিয়ার সব জাতি, সব বংশ, সব দেশ ও সব ভাষাভাষীর জন্য শিক্ষার দ্বার ছিল উন্মুক্ত। এটিই হচ্ছে সত্যিকার Education for All তথা 'সবার জন্য শিক্ষা'র উত্তম নিদর্শন। মহানবী (সা.)-এর শিষ্যদের চরিত্র ও এর প্রভাব সম্পর্কে কিছু আলোচনাও এ প্রসঙ্গে অপরিহার্য। তাঁর শিক্ষাগার থেকে প্রথমসারিতে যাঁদের নাম উল্লেখযোগ্য, তাঁরা হচ্ছেন ইসলামের চার খলিফা হযরত আবুবকর (রা.), উমর (রা.), উসমান (রা.) ও আলী (রা.)। তাঁদের চারিত্রিক দৃঢ়তা ও সাহসিকতার সামনে তদানীন্তন বড় শাসকগণের রাজনীতি, কূটনীতি, প্রশাসন নিষ্প্রভ ও মূল্যহীন হয়ে যায়। তাঁদের ইনসাফ ও ন্যায়বিচারের সামনে ইরানি শাসনতন্ত্র ও রোমীয় আইন অকেজো প্রমাণিত হয়। হযরত খালিদ বিন ওয়ালীদ (রা.)-এর রণনৈপুণ্য ও সেনাপতিত্ব রোম ও পারস্যের দাপট ও প্রতিপত্তিকে ধরাশায়ী করে দেয় অচিরেই। তেমনিভাবে সাদ (রা)-এর বাহুবল ইরাক ও ইরানের রাজমুকুটকে ইসলামের পদতলে স্থাপিত করে দেয়।

উলামা ও ফকীহদের মধ্যে হযরত উমর (রা.), আলী (রা.), আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা.), ইবনে আব্বাস (রা.), ইবনে মাসউদ (রা.), আয়েশা (রা.), উম্মে সালমা (রা.) প্রমুখ সাহাবী বিশ্বের আইন ও ফিকাহ শাস্ত্রের সুদৃঢ় ভিত রচনা করে গেছেন।

আসহাবে সুফফার দলটি ছিল ৭০ জন সাহাবীর সমষ্টি। তাঁর কৃচ্ছ্র সাধনায় জ্ঞান পিপাসা নিবৃত্তির জন্য যে ত্যাগ ও কোরবানীর নজির রেখে গেছেন, তা কিয়ামত অবধি সমুজ্জ্বল আদর্শ হয়ে

থাকবে। তাঁরা দিনের বেলায় জঙ্গলে কাঠ কাটতেন জীবিকা নির্বাহের জন্য, আর রাতভর ইবাদত করতেন আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের নিমিত্তে।

শিক্ষক-শিষ্যের সম্পর্ক কিরূপ ছিল, তাও এ ক্ষেত্রে লক্ষণীয়। রাসূলে করীম (সা.)-এর সম্পর্ক ও প্রভাব থেকে দূরে সরানোর জন্য হযরত বিলাল (রা.), হযরত খাব্বাব (রা.)-এর ওপর যে নির্যাতন হয়েছিল, তা ইতিহাসে চির-নতুন হয়ে আছে। হযরত আম্মার (রা.), হযরত যুবায়ের (রা.), এমনকি হযরত উসমান (রা.)-কেও অনুরূপ নির্যাতন সহ্য করতে হয়েছিল। তাঁদের একমাত্র অপরাধ ছিল তাঁরা রাসূলে করীম (সা.)-এর শিক্ষা ও চরিত্রের অনুসরণ করতেন। হিজরতের সময় হযরত আলী (রা.) রাসূলুল্লাহ (রা.)-এর শয্যায় রাত যাপন, ইসলাম কবুল করার অপরাধে স্ত্রী অঙ্গে আবু জাহেল কর্তৃক আঘাতে বিবি সুমাইয়া (রা.)-এর শাহাদাতবরণ, উহুদ ও হুনাইনের যুদ্ধে আবু দোজাহাহ (রা.)-এর মতো সাহাবীদের মাধ্যমে দেহবর্ম গঠন ইত্যাকার গুরুভক্তির এমন দৃষ্টান্ত কি পৃথিবীর ইতিহাস একবারের জন্যও দেখাতে সক্ষম?

পৃথিবীর দার্শনিক, শিক্ষাবিদ ও পণ্ডিতরা এটা ভেবে বিস্মিত যে কিভাবে একজন লোকের পক্ষে বিশ্বমানবতার শিক্ষক হওয়া সম্ভব। মাত্র ২৩ বছরের নবুয়তীজীবনে তিনি এত এত জ্ঞান বিতরণ করেছেন, দেড় হাজার বছর ধরে গোটা পৃথিবীর কোটি কোটি মানুষ তাঁর কাছ থেকে জ্ঞান আহরণ করে যাচ্ছে। কিন্তু তাঁকে পাঠ করার পর্ব কিছুতেই শেষ হচ্ছে না। বরং দিন যতই যাচ্ছে, ততই পৃথিবী তাঁর হাজার বছর আগের উচ্চারিত শব্দমালা থেকে নতুন দিনের দিশা খুঁজে পাচ্ছে। এটা কিভাবে সম্ভব? পৃথিবীতে আরো বহু মনীষী এসেছেন, আরো অগণিত নবী এসেছেন, কিন্তু তাবৎ বিশ্ব মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা.) থেকে প্রাপ্ত জ্ঞানকে সব কষ্টিপাথরে যাচাই করে সর্বোৎকৃষ্টরূপে পেয়েছে। তাহলে তিনি কিভাবে 'ক্লাস' নিতেন? তাঁর পাঠদান পদ্ধতি কী ছিল? এ প্রশ্ন সবার। উপমহাদেশের বিশিষ্ট ইসলামিক স্কলার মুফতী তাকি উসমানী এ প্রশ্নের জবাব খুঁজেছেন। তিনি শিক্ষার সিলেবাস সম্পর্কে লিখেছেন 'হামারা তা'লীমী নেজাম' ہمارا تعلیم ینظام

তাঁর মতে, মহানবী (সা.)-এর শিক্ষা বিপ্লবের পেছনে দুটি বিষয় কাজ করেছে। এক. তিনি যে উপদেশ শিক্ষা দিতেন, তা সবার আগে নিজে করে দেখাতেন। কাউকে ফরয নামাযের উপদেশ দেওয়ার আগে তিনি ফরযের পাশাপাশি তাহাজ্জুদ ও নফল নামায পড়ে পা মোবারক ফুলিয়ে ফেলতেন। মানুষকে তিনি ফরয রোজার নির্দেশ দিয়ে তিনি নিজে ফরয রোজার পাশাপাশি সপ্তাহে সোমবার ও বৃহস্পতিবার; প্রতি মাসের ১৩, ১৪ ও ১৫ তারিখ, আশুরা ইত্যাদি নফল রোজা বাধ্যতামূলকভাবে রাখতেন। তিনি মানুষকে যাকাত দিতে বলতেন। কিন্তু নিজে প্রয়োজনের অতিরিক্ত সর্বস্ব সদকা করে দিতেন। তিনি কাউকে মিষ্টি ত্যাগ করার পরামর্শ দেওয়ার আগে নিজে মিষ্টান্ন খাবার গ্রহণ ত্যাগ করতেন। এভাবে শিক্ষা দেওয়ার কারণে তাঁর শিক্ষা ফলপ্রসূ হয়েছে। মানুষ তাঁর কাছ থেকে শিক্ষার পাশাপাশি দীক্ষাও গ্রহণ করেছে।

দুই. তাঁর সঙ্গে তাঁর ছাত্রদের সম্পর্ক ক্লাসের আনুষ্ঠানিকতার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। তাঁর সঙ্গে ছাত্রদের যে বন্ধন তৈরি হয়েছিল, সেটি আত্মার সূতিকায় আবদ্ধ ছিল। কখনো কখনো তা আত্মীয়তার চেয়েও প্রগাঢ় সম্পর্কে রূপ নিয়েছে। কারো অনুপস্থিতি তাঁকে পীড়িত করত। কারো অনাহার তাঁকে ব্যথাতুর করত। কারো কষ্ট তাঁকে বিচলিত করে তুলত। ছাত্রদের প্রতি তিনি এতই কোমলপ্রাণ ছিলেন তাদের ব্যক্তিগত ও পারিবারিক বিভিন্ন প্রয়োজন মেটাতেও তাঁর চেষ্টার কমতি ছিল না। তাঁর সম্পর্কে কোরআন বলছে,

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ

অর্থ : 'আল্লাহর দয়ায় তুমি তাদের প্রতি কোমল হৃদয় হয়েছ। যদি তুমি রূঢ় ও কঠিনচিত্ত হতে, তাহলে তারা তোমার আশপাশ থেকে সরে পড়ত।' (সূরা : আলে ইমরান, আয়াত : ১৫৯)

মহানবী (সা.)-এর পাঠদান পদ্ধতি

থেমে থেমে পাঠদান :

রাসূলুল্লাহ (সা.) পাঠদানের সময় থেমে থেমে কথা বলতেন। যেন তা গ্রহণ করা শিক্ষার্থীদের জন্য সহজ হয়। হযরত আবু বাকরাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সা.) বলেন, 'তোমরা কি জানো, আজ কোন দিন? ...এটি কোন মাস? ...এটি কি জিলহজ নয়? ...এটি কোন শহর?' (সহীহ বোখারী, হাদীস নম্বর : ১৭৪১) প্রতিটি প্রশ্নের পর রাসূলুল্লাহ (সা.) চুপ থাকতেন। সাহাবীরা জবাবে বলতেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ভালো জানেন।

ভাষা ও দেহভাষার সমন্বয় :

রাসূলুল্লাহ (সা.) কোনো বিষয়ে আলোচনা করলে, তার দেহাবয়বেও তার প্রভাব প্রতিফলিত হতো। তিনি দেহ-মনের সমন্বিত ভাষায় পাঠদান করতেন। এতে বিষয়ের গুরুত্ব ও মাহাত্ম্য সম্পর্কে শিক্ষার্থীরা সঠিক ধারণা পেত। তিনি যখন জান্নাতের কথা বলতেন, তখন তাঁর দেহে আনন্দের স্ফূরণ দেখা যেত। জাহান্নামের কথা বললে ভয়ে চেহারার রং বদলে যেতো। হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা.) থেকে বলেন, 'রাসূল (সা.) যখন বক্তব্য দিতেন, তাঁর চোখ লাল হয়ে যেত, আওয়াজ উঁচু হয়ে যেত ও ক্রোধ বৃদ্ধি পেত। যেন তিনি (শত্রু) সেনা সম্পর্কে সতর্ককারী।' (সহীহ মুসলিম, হাদীস : ৪৩)

আগ্রহী শিক্ষার্থী নির্বাচন :

রাসূলুল্লাহ (সা.) বিশেষ বিশেষ শিক্ষাদানের জন্য আগ্রহী শিক্ষার্থী নির্বাচন করতেন। যেন শেখানো বিষয়টি দ্রুত ও ভালোভাবে বাস্তবায়িত হয়।

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সা.) বলেন, 'আমার উম্মতের মধ্য থেকে কে পাঁচটি গুণ ধারণ করবে ও তার ওপর আমল করবে? তিনি বলেন, আমি বলি, হে আল্লাহর রাসূল! আমি। তখন তিনি আমার হাত ধরেন ও হাতে পাঁচটি বিষয় গণনা করেন।' (মুসনাদে আহমদ, হাদীস : ৮০৯৫)

উপমা দিয়ে বোঝানো :

নবী করীম (সা.) অনেক সময় কোনো বিষয় স্পষ্ট করার জন্য উপমা ও উদাহরণ পেশ করতেন। কেননা উপমা ও উদাহরণ দিলে যেকোনো বিষয় বোঝা সহজ হয়ে যায়। হযরত সাহাল ইবনে সাদ (রা.) থেকে বলেন, রাসূল (সা.) ইরশাদ করেছেন, 'আমি ও এতিমের দায়িত্ব গ্রহণকারী জান্নাতে এমনভাবে অবস্থান করব। সাহাল (রা.) বলেন, রাসূল (সা.) তাঁর শাহাদাত ও মধ্যমা আঙুলের প্রতি ইঙ্গিত করেন।' (সহীহ বোখারী, হাদীস : ৬০০৫)

শিক্ষার্থীর প্রশ্ন গ্রহণ :

শ্রেণীকক্ষে শিক্ষকের আলোচনা শুনে শিক্ষার্থীর মনে প্রশ্ন জাগতে পারে। এসব প্রশ্নের সমাধান না পেলে অনেক সময় পুরো বিষয়টিই শিক্ষার্থীর কাছে অস্পষ্ট থেকে যায়। রাসূল (সা.) শিক্ষাদানের সময় শিক্ষার্থীর প্রশ্ন গ্রহণ করতেন। হযরত আবু আইয়ুব আনসারী (রা.) থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি রাসূল (সা.)-কে প্রশ্ন করে, আমাকে বলুন! কোন জিনিস আমাকে জান্নাতের নিকটবর্তী করে দেবে এবং কোন জিনিস জাহান্নাম থেকে দূরে সড়িয়ে নেবে। নবী করীম (সা.) থামেন ও তাঁর সাহাবাদের দিকে তাকান। অতঃপর তিনি বলেন, তাকে তাওফীক দেওয়া হয়েছে অথবা বললেন, তাকে হেদায়াত করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (রা.) জিজ্ঞাসা করেন, তুমি কী বললে? বর্ণনাকারী বলেন, সে তার পুনরাবৃত্তি করে। নবী করীম (রা.) বলেন, তুমি আল্লাহর ইবাদত করবে, তাঁর সঙ্গে কাউকে শরীক করবে না, নামায কায়েম করবে, যাকাত দেবে ও আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখবে, (এবারে) উটনী ছেড়ে দাও।' (সহীহ মুসলিম, হাদীস : ১২)

বিবেকের মুখোমুখি করা :

বিবেক জাগ্রত থাকলে মানুষ নানা অপরাধ থেকে বেঁচে যায় এবং বিবেক লুপ্ত হলে অপরাধে জড়িয়ে পড়ে। তাই মানুষকে সঠিক পথে পরিচালিত করার সহজ উপায় হলো, মানুষের বিবেক ও মনুষ্যত্ব জাগিয়ে তোলা। রাসূল (সা.) বিবেক ও মনুষ্যত্ব জাগিয়ে তোলার মাধ্যমেও মানুষকে শিক্ষাদান করেছেন। এক যুবক রাসূল (সা.)-এর কাছে গিয়ে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে ব্যভিচারের অনুমতি দিন। তার কথা শুনে উপস্থিত লোকেরা মারমুখি হয়ে ওঠে ও তিরস্কার করে। রাসূল (সা.) তাকে কাছে ডেকে নিয়ে বলেন, তুমি কি তোমার মায়ের ব্যাপারে এমনটি পছন্দ করো? সে বলল, আল্লাহর শপথ, না। আল্লাহ আমাকে আপনার জন্য উৎসর্গিত করুন। রাসূল (সা.) বলেন, কেউ তার মায়ের ব্যাপারে এমন পছন্দ করে না। এরপর রাসূল (সা.) একে একে তার সব নিকটাত্মীয়ের কথা উল্লেখ করেন এবং সে 'না' সূচক উত্তর দেয়। এভাবে রাসূল (সা.) তার বিবেক জাগ্রত করে তোলেন।' (মুসনাদে আহমদ, হাদীস : ২২২১১)

রেখাচিত্রের সাহায্যে ব্যাখ্যা দেওয়া :

কখনো কখনো কোনো বিষয়কে স্পষ্ট করার জন্য রাসূল (সা.) রেখাচিত্র ও অঙ্কনের সাহায্য নিতেন। যেন শিক্ষার্থীর স্মৃতিতে তা রেখাপাত করে। হযরত আবু মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'রাসূল (সা.) একটি চারকোনা দাগ টানেন। এরপর তার মাঝ বরাবর দাগ দেন, যা তা থেকে বের হয়ে গেছে। বের হয়ে যাওয়া দাগটির পাশে ও চতুষ্কোণের ভেতরে ছোট ছোট কিছু দাগ দেন। তিনি বলেন, এটি মানুষ। চতুষ্কোণের ভেতরের অংশ তার জীবন ও দাগের যে অংশ বের হয়ে গেছে, সেটি তার আশা।' (সহীহ বোখারী, হাদীস : ৬৪১৭)

এভাবে রাসূল (সা.) রেখাচিত্রের সাহায্যে মানুষের জীবন ও জীবনের সীমাবদ্ধতার বিষয় স্পষ্ট করে তুলতেন।

মুক্ত আলোচনার মাধ্যমে শিক্ষাদান :

মুক্ত আলোচনা ও মতবিনিময়ের মাধ্যমে বহু জটিল ও দুর্বোধ্য বিষয় সহজ হয়ে যায়। রাসূলুল্লাহ (সা.) বহু বিষয় মুক্ত আলোচনা ও মতবিনিময়ের মাধ্যমে শিক্ষাদান করতেন। যেমন–হুনাইনের যুদ্ধের যুদ্ধলব্ধ সম্পদ বণ্টন নিয়ে আনসার সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে অসন্তোষ দেখা দিলে রাসূল (সা.) তাঁদের সঙ্গে মুক্ত আলোচনা করেন। একইভাবে বদর যুদ্ধের বন্দিদের ব্যাপারে সাহাবীদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন। (বোখারী ও মুসলিম)

গুরুত্বপূর্ণ কথার পুনরাবৃত্তি :

রাসূল (সা.) তাঁর পাঠদানের গুরুত্বপূর্ণ অংশ তিনবার পর্যন্ত পুনরাবৃত্তি করতেন। হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'রাসূল (সা.) তাঁর কথাকে তিনবার পুনরাবৃত্তি করতেন, যেন তা ভালোভাবে বোঝা যায়।' (শামায়েলে তিরমিযী, হাদীস : ২২২)

মহানবী (সা.) শিক্ষার্থীদের মেধা ও স্মৃতিশক্তির ওপর নির্ভর না করে বারবার পাঠ করতে উদ্বুদ্ধ করতেন। বারবার পাঠ করে কঠিন বিষয়কে আয়ত্ত করতে বলতেন। হযরত আবু আইয়ুব আনসারী (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সা.) বলেন, 'তোমরা কোরআনের ব্যাপারে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হও। সেই সত্তার শপথ, যার হাতে আমার জীবন, তা উটের চেয়ে দ্রুত স্মৃতি থেকে পলায়ন করে।' (সহীহ বোখারী, হাদীস : ৫০৩৩)

এভাবে শিক্ষা দিতেন বলেই মহানবী (সা.) বিশ্বমানবতার মহান শিক্ষক উপাধিতে ভূষিত হয়েছেন।

(চলবে, ইনশাআল্লাহ)

জিজ্ঞাসা ও শরয়ী সমাধান

কেন্দ্রীয় দারুল ইফতা বাংলাদেশ

পরিচালনায় : মারকাযুল ফিকরিল ইসলামী বাংলাদেশ, বসুন্ধরা, ঢাকা।

প্রসঙ্গ : শেয়ারবাজার

মুহাম্মদ হারুনুর রশিদ
মিরপুর, ঢাকা।

জিজ্ঞাসা :

১. বাংলাদেশের বিভিন্ন ব্রোকার হাউসে যে সমস্ত কম্পানির শেয়ার বেচাকেনা করা হয়। ইসলামের দৃষ্টিতে সেগুলোর কেনাবেচা জায়েয আছে কি না?

২. এক আলেম থেকে শুনেছি যে সমস্ত কোম্পানি ইসলামী শরীয়াহ মোতাবেক পরিচালিত বলে দাবি করে সে সমস্ত কম্পানির শেয়ার বেচাকেনা করা জায়েয। এ কথাটি ঠিক কি না?

৩. ইসলামী শরীয়াহ মোতাবেক পরিচালিত বলে দাবীকৃত কোম্পানি যেমন : (১) ইসলামী ব্যাংক। (২) শাহ্জালাল ইসলামী ব্যাংক। (৩) ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক। (৪) সোস্যাল ইসলামী ব্যাংক। (৫) আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক। (৬) এক্সিম ব্যাংক। (৭) আইসিবি ইসলামী ব্যাংক। (৮) ইউনিয়ন ব্যাংক। (৯) আল-ফালাহ্ ব্যাংক। (১০) ইসলামী ফিন্যান্স। (১১) ইসলামী ইনস্যুরেন্স। (১২) পদ্মা ইসলামী লাইফ ইনস্যুরেন্স ইত্যাদি কম্পানির শেয়ার বেচাকেনা জায়েয আছে কি না? দয়া করে জানালে উপকৃত হব।

সমাধান :

শেয়ার বেচাকেনা আর শেয়ারবাজারে লেনদেন করা এক কথা নয়, শেয়ার বেচাকেনার বৈধ হওয়ার চারটি শর্ত প্রসিদ্ধ ও প্রচলিত। যথা–(১) কোম্পানির মূল ব্যবসা হালাল হওয়া। (২) অভিহিত মূল্য থেকে কমবেশি মূল্যে ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে কোম্পানির সম্পদ শুধু নগদ আকারে না থাকা। (৩) প্রসপেক্টাসে সুদি ঋণ গ্রহণের কথা না থাকা সত্ত্বেও পরবর্তীতে সুদে ঋণ নিলে এর বিরুদ্ধে আওয়াজ তোলা। (৪) লভ্যাংশে সুদের মিশ্রণ থাকলে সুদ পরিমাণ সদকাহ করা। পক্ষান্তরে শেয়ারবাজারের লেনদেনের মাঝে শরীয়তবিরোধী বহু কর্মকাণ্ড বিদ্যমান। আর এ সকল কাজে মধ্যস্থতাকারী হিসেবে কাজ করে ব্রোকার হাউস। এখানে শেয়ারবাজারের শরীয়তবিরোধী তাদের কিছু লেনদেন তুলে ধরা হলো।

(১) শেয়ারবাজারে Specutation বা ফটকা কারবার করা হয় যেখানে জুয়ার চার মূল ভিত্তি বিদ্যমান থাকার কারণে, তা অবৈধ।

(২) Margin লোনে শেয়ার ক্রয়-বিক্রয় ও লোনের বিপরীত সুদ প্রদান করা, যা স্পষ্টত শরীয়তবিরোধী।

(৩) মিউচ্যুয়াল ফান্ড হারাম-হালালের কোনো তোয়াক্কা না করে সব ধরনের শেয়ার ক্রয় করে। শেয়ারহোল্ডারের কোনো কিছু করার থাকে না।

(৪) Preberence Share তথা অগ্রাধিকার শেয়ারের মাধ্যমে নির্দিষ্ট লাভ প্রদান মূলত সুদি কারবারের অন্তর্ভুক্ত ও শিরকতের চুক্তিবিরোধী।

(৫) Bitter (বিটার), অর্থাৎ যারা কোম্পানির শেয়ার ক্রয়মূল্য নির্ধারণ করে থাকে, বাধ্যতামূলক তাদেরকে একটা শেয়ারের অংশ ক্রয় করতে হয়। আর ক্রয় না করলে তার বায়নার টাকা থেকে ৫০% জরিমানা হিসেবে বাজেয়াপ্ত করা হয়, যা শরীয়তসম্মত নয়।

(৬) IPO থেকে অবিক্রীত শেয়ারের ৫০% under writer কে ক্রয় করতে বাধ্য করা হয় এবং under writing (ضمان الاكتتاب) বা দায়ভার গ্রহণের ওপর ফি গ্রহণ করা বৈধ নয়।

(৭) Bond (ঋণপত্র) Debenture. ICB ফান্ডে বিনিয়োগ করে নির্ধারিত হারে মুনাফা অর্জন সুদের অন্তর্ভুক্ত।

(৮) কারসাজির মাধ্যমে নিয়ন্ত্রকদের হাত করে শেয়ারবাজারে কৃত্রিমভাবে জোগান ও চাহিদা তৈরি করা হয়। অর্থাৎ বাস্তব জোগান ও চাহিদাকে বন্ধ করা হয়, যা শরীয়তবিরোধী।

(৯) مبيع مجهول (পণ্য নির্দিষ্ট নয়) তথা কোম্পানির ফান্ডামেন্টাল অবস্থা না জেনে গুজব শুনে হুজুগে পড়ে শেয়ার ক্রয়-বিক্রয়ের ফলে অনেক সময় ক্রেতা-বিক্রেতা দুজনই জানে না কোন পণ্যটি তারা ক্রয়-বিক্রয় করছে। এ ধরনের ক্রয়ের পর হায়হুতাশ ও বিক্ষোভ করতে দেখা যায়, অথচ এভাবে ক্রয়-বিক্রয় বৈধ নয়।

(১০) কৃত্রিমভাবে সেল প্রেসার বাড়ানোর মাধ্যমে সাধারণ মানুষদের ধোঁকা দেওয়া, এই ধোঁকা দুভাবে দেওয়া হয়ে থাকে। (ক) কাজের মাধ্যমে। (খ) কথার মাধ্যমে।

কাজের মাধ্যমে যেমন–কোম্পানির কিছু শেয়ার দেখানোর জন্য বেশি দামে ক্রয় করা, যাতে অন্য মানুষেরা মনে করে যে উক্ত শেয়ারের মূল্য উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে, তাই লাভের আশায় আরো বেশি দামে উক্ত শেয়ার ক্রয় করে।

কথার মাধ্যমে যেমন–কোনো কোম্পানির নামে মিথ্যা কিছু ভালো দিক

প্রচার করা, যাতে মানুষ আকৃষ্ট হয়ে ওই কোম্পানির শেয়ার ক্রয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ে। হাদীসের ভাষায় এটাকে نجش বলা হয়, যা স্পষ্ট হারাম।

(১১) আইপিও ব্যবসা, যা সম্পূর্ণ ধোঁকা ও প্রতারণার ওপর নির্ভর করে, দুই পক্ষ থেকে এটা হয়ে থাকে, অনেক সময় দুর্বল ভিত্তির কোম্পানি ক্রেডিট রেডিং এজেন্সি এবং এসএসিসহ বাজার নিয়ন্ত্রক কর্তৃপক্ষকে হাত করে ভালো প্রিমিয়ামে আইপিওতে আসে, জনগণ ওই শেয়ার ক্রয় করে প্রতারিত হয়। এর বিপরীত কখনো আইপিও ব্যবসায়ীরা ক্রেডিট রেডিং এজেন্সিসহ সংশ্লিষ্টদের ম্যানেজ করে কোম্পানিকে কম মূল্যে আইপিওতে আসতে বাধ্য করে। এরপর চড়া মূল্যে ওই শেয়ার ক্রয়-বিক্রয় চলে। এতে কোম্পানি প্রতারিত হয়। শরীয়তের দৃষ্টিতে বাজারের বাস্তব অবস্থা ক্রেতা-বিক্রেতার কাছে গোপন করে ফায়দা লোটা নিষেধ। হাদীসে بيع الحاضر للبادى এবং تلقى جلب এর ব্যাপারে কঠোর নিষেধাজ্ঞা আছে।

(১২) গুজব ছড়িয়ে সূচকের উত্থান-পতন ঘটানো আমাদের দেশের শেয়ারবাজারে চলছে, মূলত বিভিন্ন গুজবকে কেন্দ্র করে দীর্ঘ মেয়াদে বিনিয়োগ করার লোক এখানে কম, ডে ট্রেডারের দৌরাত্ম্য বেশি। শরীয়তের দৃষ্টিতে মিথ্যা বলা ও রটানো মহাপাপ, উপরন্তু মিথ্যার ভিত্তিতে কোটি কোটি টাকার মুনাফা লোটা আরো মারাত্মক।

(১৩) সেকেন্ডারি মার্কেট থেকে শেয়ার ক্রয়ের মাধ্যমে কোম্পানির ব্যবসায় শরীক হলেও লভ্যাংশের কোনো হার নির্ধারণ করা হয় না। ডিভিডেন্ট ঘোষণা সম্পূর্ণ পরিচালনা পরিষদের ইচ্ছাধীন। তারা নিজেদের স্বার্থের প্রতি লক্ষ করে কমবেশি ঘোষণা করে থাকে। অথচ শরীয়তের দৃষ্টিতে শিরকতের চুক্তি সহীহ হওয়ার অন্যতম শর্ত হচ্ছে লভ্যাংশের হার ধার্য করে নেওয়া।

(১৪) শেয়ারবাজারে হার জতের খেলা চলে, একদল জিততে হলে যেভাবে অপর দলকে হারাতে হয়, অনুরূপ খেলায় জেতার জন্য অপরকে হারানোর সকল কৌশল অবলম্বন করা হয়। অথচ ক্রয়-বিক্রয় বৈধ হওয়ার জন্য উভয় পক্ষের تراضى (রাজি থাকা) শর্ত।

(১৫) মিথ্যা তথ্যের কারণে শেয়ারবাজার থেকে ক্রয়কৃত পণ্যে কোনো ত্রুটি ধরা পড়লে পণ্যটি ফেরত দেওয়ার কোনো সুযোগ থাকে না। অথচ শরীয়তের বিধান মতে ক্রয়-বিক্রয়ের মাঝে خيار رويت ও خيار عيب সুপ্রমাণিত।

(১৬) এমনকি ক্রেতা যদি ভুলক্রমে বেশি মূল্য দিয়ে দেয় বিক্রেতার কাছ থেকে সেটা আর ফেরত পাওয়া যায় না। যেমন কেউ একটি শেয়ার ৫০০/- টাকায় সেল করার প্রস্তাব দেয়, অপর দিক থেকে ক্রেতা ভুলক্রমে ৫০০০/- লিখে দেয় তবে সার্কিট ব্রেকার না থাকলে সিস্টেম তা নিয়ে নেবে। ৪৫০০/- আর ফেরত পাওয়া যাবে না। অথচ বিক্রেতা অতিরিক্ত টাকা ফেরত দিতে শরীয়তের দৃষ্টিতে বাধ্য। এতে বোঝা যায় এটা স্বাভাবিক ক্রয়-বিক্রয় নয় বরং ঝুঁকিপূর্ণ একটি হারজিতের খেলা।

(১৭) শেয়ারবাজারে বিনিয়োগকারীগণ তিন ধরনের লেনদেন করে থাকে ক্যাপিটাল গেইন, ডিভিডেন্ট গেইন, এবং ডে ট্রেডিং। বাজার বিশেষজ্ঞদের মতে, প্রথম দুটি হচ্ছে বিনিয়োগ আর শেষোক্তটি হচ্ছে ফটকা বা জুয়া। শরীয়তের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা হলে এর মাঝে যে ঝুঁকি ও অনিশ্চয়তার মধ্য দিয়ে সম্পূর্ণ ধারণানির্ভর বিনিয়োগ পরিলক্ষিত হয় তাকে تعليق بالخطر বলে গণ্য করা যায়। কাজেই এটা قمار (জুয়া) বা شبه قمار (জুয়ার সাদৃশ্য) এর পর্যায়ভুক্ত।

(১৮) শেয়ারবাজারের প্রতিটি রন্ধ্রে সুদ প্রবিষ্ট। শেয়ারবাজারের টাকা যতগুলো অ্যাকাউন্ট অতিক্রম করে সকল স্থানে সুদের লেনদেন। যেমন–আইপিওর আবেদনের টাকা এবং আইপিও রিফান্ডের টাকা থেকে ইস্যুয়ার কোম্পানি সুদ পেয়ে থাকে। শেয়ার ক্রয়ের জন্য ব্রোকার হাউসে যে টাকা জমা করা হয় তা ভিন্ন অ্যাকাউন্টে রেখে সুদ পায় ব্রোকার হাউস। নিজের অ্যাকাউন্টের সুদ তো আছেই। ব্রোকার হাউস মালিকদের প্রতিষ্ঠান স্টক এক্সচেঞ্জ তাদের সমুদয় অর্থ ব্যাংকে রেখে সুদ কামায়। স্টক এক্সচেঞ্জ তাদের টাকা অলস তহবিল হিসেবে বসিয়ে না রেখে সরকার বা শিল্পপতিদের কাছে লগ্নি করে মোটা অঙ্কের সুদ পায়। শেয়ারবাজারের সমুদয় অর্থ বিভিন্ন তফসিলি ব্যাংকে জমা রাখা বাধ্যতামূলক। ব্যাংক ওই অর্থ দিয়ে সুদভিত্তিক লগ্নি করে থাকে। এ ছাড়া আরো অনেক পদ্ধতিতে সুদি লেনদেন চালু আছে।

(১৯) রেকর্ড ডেটের পর স্টক এক্সচেঞ্জের পক্ষ থেকে শেয়ারের দাম বাধ্যতামূলক কমিয়ে XB. XD. XR দরকে ওপেনিং প্রাইজ ধার্য করা শরীয়তসম্মত নয়।

(২০) মূল্য সংবেদনশীল তথ্য ফাঁস করে ব্রোকার হাউস বা কোম্পানির সুবিধাভোগী কর্তৃক অর্থ হাতিয়ে নেওয়া এবং সাধারণ বিনিয়োগকারীদের ক্ষতিগ্রস্ত করা।

অতএব, শেয়ারবাজারের লেনদেনে

অংশগ্রহণ শরীয়তসম্মত হতে পারে না। (সূরা মাইদা-৯০, ফতওয়ায়ে উসমানী-৩/১৯৭, ইবনে মাজাহ-৪০৮)

প্রসঙ্গ : নামায-রোজার সময়সূচি

মুহাম্মদ হায়দার চৌধুরী
সৈয়দপুর, নীলফামারী।

জিজ্ঞাসা :

আমরা সৈয়দপুরবাসী সেহরী, ইফতার, নামায ইত্যাদির সঠিক সময়ের সম্বন্ধে সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগছি। আমাদের নীলফামারী জেলার সৈয়দপুর উপজেলার দুটি স্বনামধন্য দাওরায়ে হাদীস সমমানের মাদরাসা হতে প্রতি রমাজানে প্রকাশিত রমাজানের ক্যালেন্ডারে দেখা যায় যে, তারা ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ প্রণীত নামায, সেহরী, ইফতারের ঢাকা জেলার স্থায়ী সময়সূচির সাথে প্রতিবছরই ৫ মি. যোগ করে ক্যালেন্ডার ছেপে থাকে, যা নীলফামারী জেলা ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রকাশিত রমাজানের ক্যালেন্ডারের সময়ের সাথে মেলে না। যেমন–এ বছর ইসলামিক ফাউন্ডেশন, নীলফামারী জেলা যেখানে ইফতারের সময় উল্লেখ করেছে ৬.৫৪ মি. সেখানে মাদরাসাওয়ালারা দিয়েছে ৬.৪৯ মি.। সে মতে আমরা ৫ মি. পূর্বেই ইফতারী করেছি। এরূপে সেহরীও খেয়েছি ৫ মি. বাড়িয়ে। এ ব্যাপারে মাদরাসার মুহতামীমের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তাঁরা বলেন যে আমরা বসুন্ধরা ইসলামিক রিসার্চ সেন্টার প্রকাশিত সময়সূচি অনুযায়ী ৫ মি. যোগ করে ক্যালেন্ডার প্রস্তুত করেছি। দেয়ালে ঝোলানো মাকতাবাতুল ফাতাহ প্রকাশিত ও হযরত ফকীহুল মিল্লাত (রহ.) নির্দেশিত সময়সূচির দিকে তিনি ইশারা করলে সেখানে দেখা গেল যে, ঢাকার সময়ের সাথে নীলফামারী জেলার সেহরী, ইফতার, ইত্যাদিতে ৫ মি. যোগ করতে বলা হয়েছে, যা ঢাকার সময় উল্লেখ করার পর বি.দ্র. দিয়ে নিচে উল্লেখ করা হয়েছে।

এখন প্রশ্ন হলো যে (১) আমরা কি মাদরাসাপ্রণীত ক্যালেন্ডার অনুযায়ী সেহরী, ইফতার করব, নাকি ইসলামিক ফাউন্ডেশনপ্রণীত সময়সূচি মেনে চলব? (২) মাদরাস গুলো যেহেতু সংশ্লিষ্ট জেলা বা উপজেলার জন্য বাৎসরিক স্থায়ী সময়সূচি ছাপে না, সেহেতু রমাজানের বাইরে অন্য মাসগুলোতে আমরা কিভাবে সেহরী, ইফতার করব? (৩) ফজর শুরু ও সূর্যোদয়ের সঠিক সময় জানব কিভাবে? (৪) সূর্যোদয়ের সময় উল্লেখ করার পর ওই সমস্ত ক্যালেন্ডারে সূর্যোদয়ের পর ১০ মি. বা ২৩/২৪ মি. পর ইশরাক আদায়ের কথা বলা হয়েছে। তাহলে মধ্যবর্তী সময়টি কি হারাম ওয়াক্ত? উহা কি আদতে ১০ মি. নাকি ২৩/২৪ মি.? (৫) সেহরী-ইফতারে ৫ মি. সারা বছরই যোগ হবে? উহা কি কমবেশি হয় না? অথবা ঢাকার সময়ের সাথে ৫ মি. যোগ-বিয়োগ ভিত্তি আছে কি না? এবং থাকলে তা কতটুকু সত্য এবং কিভাবে? অতএব নিবেদন এই যে উপরোক্ত প্রশ্নগুলোর উত্তর প্রদান করে আমাদের কৃতজ্ঞকরত জনাবের মর্জি হয়।

সমাধান :

(১-২) অক্ষাংশ ও দ্রাঘিমাংশের ডিগ্রির পরিবর্তনের ভিত্তিতে সময়ের পরিবর্তন ঘটে থাকে। তাই এক জেলার সময়ের সাথে কয়েক মিনিট যোগ-বিয়োগ করে অন্য জেলার ক্যালেন্ডার ছাপা ঠিক নয়। সুতরাং প্রত্যেক জেলার ডিগ্রি হিসাবে স্বতন্ত্র ক্যালেন্ডার ছাপা উচিত। এ কারণে বসুন্ধরা ও ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রত্যেক জেলার জন্য স্বতন্ত্র সময়সূচি তৈরি করেছে। আপনারা চাইলে ইসলামিক ফাউন্ডেশন কর্তৃক প্রণীত নীলফামারী জেলার সময়সূচি মেনে চলতে পারবেন।

(৩) ফজর শুরু ও সূর্যোদয়ের সঠিক সময় জানার দুটি উপায় থেকে কোনো একটি অবলম্বন করতে পারবেন। ১. স্বচক্ষে দেখার মাধ্যমে অথবা কোনো অভিজ্ঞ আলেমের শরণাপন্ন হয়ে। ২. নির্ভরযোগ্য স্থায়ী সময়সূচি ছাপা ক্যালেন্ডারের মাধ্যমেও হতে পারে।

(৪) ক্যালেন্ডারে সূর্যোদয়ের পর ১০ মি. পরে ইশরাক আদায়ের কথা বলা হয়েছে। এই ১০ মি. ও অনেক সতর্কতা অবলম্বন করার পরই বলা হয়েছে। এর পূর্বে নামায আদায় করা মাকরূহে তাহরীমী।

(৫) অক্ষাংশ ও দ্রাঘিমাংশের ডিগ্রির পরিবর্তনের কারণে প্রতি জেলার সময় প্রতি মাসে কিছু কমবেশি হতে পারে, তাই কোনো এক জেলার সময়সূচি উল্লেখ করে অনুমান মূলক অন্যান্য জেলার সময়সূচী নির্ধারণ করা আবহাওয়াবিদগণের মত ও অভিজ্ঞতার আলোকে সঠিক নয়। (রদ্দুল মুহতার-১/৩৫৯, ফতওয়ায়ে হিন্দিয়া-১/৫১, আহসানুল ফতওয়া-২/১৬৩)

প্রসঙ্গ : কসম

মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ
বসুন্ধরা, ঢাকা।

জিজ্ঞাসা :

জাহিদ সাহেবের ছেলে রাশেদ কারণবশত পুলিশের হাতে গ্রেফতার হয়, খবর পেয়ে জাহিদ সাহেব রাগে আল্লাহর কসম খেয়েছেন, রাশেদকে কোনো প্রকার খরচ দেবেন না। অনুতপ্ত হয়ে এখন উনি জানতে চাচ্ছেন

রাশেদকে খরচ দিতে পারবেন কি না? অথবা অন্য কোনো উপায় আছে কি না?

সমাধান :

জাহিদ সাহেবের জন্য এখন করণীয় হলো, কসম ভেঙে তাঁর ছেলেকে খরচ দিতে থাকা। আর কৃত কসম ভঙ্গ হয়ে যাওয়ার কারণে কসম ভঙ্গের কাফফারা আদায় করবে। উল্লেখ্য, কসম ভঙ্গের কাফফারা হলো দশ জন মিসকিনকে দুই বেলা পেট ভরে খাওয়ানো বা দশ জনকে দশ জোড়া পোশাক দিয়ে দেওয়া বা তার মূল্য পৃথক পৃথক মিসকিনকে দিয়ে দেওয়া, আর যদি তা আদায় করতে অক্ষম হয়, তাহলে তিন দিন ধারাবাহিকভাবে রোজা রাখা। (সূরা মায়েদা ৮৯, কনজুদ্দাকায়েক-১৬৪, মাজমাউল আনহুর-২/২৬৩, আপকে মাসায়েল আউর উনকা হল-৪/২৮৬)

প্রসঙ্গ : ইহুদি পণ্য

মুহাম্মদ জসিমুদ্দীন
বসুন্ধরা, ঢাকা।

জিজ্ঞাসা :

কয়েক বছর আগে ফিলিস্তিনে গাজায় ইসরায়েলের হামলার সময় একটি বিজ্ঞাপনে পেপসি, কোকা-কোলা ও সেভেনআপসহ কিছু ইহুদি পণ্যের ছবি দিয়ে বলা হয় এসব পণ্য ব্যবহার করা মুসলমানদের রক্ত ব্যবহার করার সমতুল্য। আমার জিজ্ঞাসা, বাজারে বিদ্যমান এসব পণ্য ব্যবহার বা খাওয়া জায়েয আছে কি না? বিস্তারিত জানালে উপকৃত হব।

সমাধান :

পেপসি, কোকা-কোলা, সেভেনআপসহ অমুসলিমদের তৈরি পণ্য নাপাকী বা হারাম জিনিসের মিশ্রণ সম্মন্ধে সুনিশ্চিতভাবে জানা না থাকলে তা ব্যবহার করা নাজায়েয নয়, তবে এর জন্য সচেতন মুসলমানের করণীয় হলো, যথাসাধ্য ইসলামের দুশমনদের পণ্য বর্জন করার চেষ্টা করা এবং দেশীয় পণ্য বা মুসলিম দেশে তৈরি আমদানীকৃত মাল ক্রয়-বিক্রয় করা। (ফাতাওয়ায়ে হিন্দিয়া-৫/৪১২, ইমদাদুল ফাতাওয়া-৪/১০৬, ফাতাওয়ায়ে মাহমুদিয়া-১৪/৫৬)

প্রসঙ্গ : কোরবানী

মাও. সুলতান আহমেদ
সোনারগাঁ, নারায়ণগঞ্জ।

জিজ্ঞাসা :

কোনো এক সমাজে প্রত্যেকের কোরবানীর গোস্ত সামাজিকভাবে অর্ধেক দেওয়া বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। যদি কেউ তা না দেয় তাহলে তাকে সামাজিকভাবে হেয়প্রতিপন্ন করা হয়। অতঃপর এই গোস্ত সমাজের সকলেই ভাগ করে নেয়। সুতরাং এ ক্ষেত্রে শরীয়তের হুকুম কী? এবং যারা বাধ্য করে তাদের শাস্তি কী হবে? জানালে কৃতজ্ঞ হব।

সমাধান :

কোরবানীর গোস্ত বণ্টনের মুস্তাহাব তরীকা হলো সমুদয় গোস্তের এক-তৃতীয়াংশ নিজ পরিবারের জন্য রেখে বাকি দুই ভাগের এক ভাগ আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধবদের জন্য আর অপর ভাগ অসহায়-গরিবদের মাঝে বণ্টন করা। এ কাজটি যেমনিভাবে ব্যক্তিগতভাবে করা যায়, তেমনি স্বেচ্ছায়, যৌথভাবেও করা যায়। প্রশ্নে বর্ণিত পদ্ধতি যেহেতু সামাজিক প্রথা হিসেবে বাধ্যতামূলক করা হয়েছে উপরন্তু সেখানে কারো ওসিয়ত বা মান্নতের কোরবানীও থাকতে পারে তাই উক্ত পদ্ধতি শরীয়তসম্মত বলে বিবেচিত হবে না। (ফাতাওয়ায়ে হিন্দিয়া-৫/৩০০, ফাতাওয়ায়ে হক্কানিয়া-৬/৪৭৪, ফাতাওয়ায়ে মাহমুদিয়া-১১/৩৪২)

প্রসঙ্গ : তারাবীহ

মুহাম্মদ আব্দুল জাব্বার
মহেশখালী, কক্সবাজার।

জিজ্ঞাসা :

(১) তারাবীর নামাযে জামাআত সহকারে আদায়কালে ক্বিরাত আস্তে বা উচ্চস্বরে পড়ার শরয়ী বিধান কী?

(২) তারাবীর নামাযে প্রত্যেক সূরার শুরুতে বিসমিল্লাহ উচ্চস্বরে পড়ার শরয়ী বিধান কী? বিস্তারিত জানিয়ে বাধিত করবেন।

সমাধান-১ :

জামাআতের সাথে তারাবীর নামায আদায় কালে ইমামের জন্য উচ্চস্বরে ক্বিরাত পড়া ওয়াজিব। (রদ্দুল মুহতার-১/৪৬৯, বাদায়ে উসসনায়ে-১/৬৮২, কিফায়াতুল মুফতী-৪/৪৬১)

সমাধান-২ :

তারাবীর নামাযে প্রত্যেক সূরার শুরুতে নিম্নস্বরে বিসমিল্লাহ পড়া সুন্নাত। তবে উচ্চস্বরে পড়লেও কোনো সমস্যা নেই। উল্লেখ্য, খতমে তারাবীতে যেকোনো এক সূরার শুরুতে উচ্চস্বরে বিসমিল্লাহ বলতে হবে, অন্যথায় খতমে তারাবীর সুন্নাত পরিপূর্ণ হবে না। (ফাতাওয়ায়ে রশীদিয়া-১৯২, ফতওয়ায়ে মাহমুদিয়া-২/৩৪৬)

প্রসঙ্গ : ইসলামী ব্যাংকের কাছে ঘর ভাড়া দেওয়া

হাফেজ ইয়াহয়া
মাদবদী, নরসিংদী।

জিজ্ঞাসা :

আমাদের মাদরাসার খরচ অনেক বেশি।

বর্তমানে মাদরাসার আয় দিয়ে ভালোভাবে চলতে অনেক হিমশিম খেতে হয়। ইসলামী ব্যাংককে মাদরাসার দ্বিতীয় তলা ভবনে ভাড়া দিলে প্রতি মাসে আয়ের একটু উৎস হবে। ব্যয়ের হিসাবের দিকে লক্ষ করে ইসলামী ব্যাংককে ভাড়া দিয়ে মাদরাসা ও এতিমখানায় ব্যবহার করা যাবে কি না? সঠিক উত্তর দিয়ে মাদরাসার আর্থিকের দিকে লক্ষ করে হুজুরের সুমর্জি কামনা করছি।

সমাধান :

আমাদের দেশের প্রচলিত ইসলামী ব্যাংকগুলো সুদমুক্ত হওয়ার দাবি করে থাকে। তার বিপরীত প্রমাণিত না হলে তাদের কার্যক্রম এবং আয় অবৈধ বলা যাবে না, বিধায় নিজ দায়িত্বে যাচাই-বাছাই করে তাদের লেনদেনের ওপর আস্থা অর্জন হলে ইসলামী ব্যাংকের কার্যক্রম পরিচালনা করার জন্য ভবন ভাড়া দেওয়া জায়েয হবে। তবে যে ভবন মাদরাসার ছাত্রদের পড়াশোনার জন্য বা থাকার জন্য বানানো হয়েছে, তা উক্ত কাজগুলোতে ব্যাঘাত ঘটিয়ে ভাড়া দেওয়া জায়েয হবে না। (সূরা বাকারা-২৭৫, ফাতাওয়ায়ে হিন্দিয়া-৫/৩২০, কাওয়াইদুল ফিক্বাহ-৮৫)

প্রসঙ্গ : ওয়াকফ

মাও. শিহাবুদ্দীন
সলঙ্গা, সিরাজগঞ্জ।

জিজ্ঞাসা :

আমাদের গ্রামের মাদরাসায় পুরাতন একটি মসজিদ আছে ওয়াক্‌ফকৃত, একজন দাতা মাদরাসার ভিন্ন জায়গায় মসজিদ বানিয়ে দিতে চায়। এখন আমার জানার বিষয় হলো :

(ক) বিনা প্রয়োজনে পুরাতন মসজিদ ফেলে রেখে নতুন জায়গায় মসজিদ বানানো জায়েয হবে কি?

(খ) বিনা প্রয়োজনে মাদরাসার জন্য ওয়াক্‌ফকৃত জায়গায় মসজিদ বানানো বৈধ হবে কি, যখন নামাযের জন্য একটি (ওয়াক্‌ফকৃত) মসজিদ আছে, আর বানিয়ে ফেললে পুরাতন মসজিদটির হুকুম কী?

সমাধান :

(ক, খ) মাদরাসার ওয়াক্‌ফকৃত জায়গা শুধুমাত্র মাদরাসার প্রয়োজনে ব্যবহার করা বৈধ। তাই মাদরাসার পুরাতন মসজিদ মাদরাসাবাসীর জন্য যথেষ্ট হলে মাদরাসার জন্য ওয়াক্‌ফকৃত জায়গায় মসজিদ বানানো বৈধ হবে না। আর বানিয়ে ফেললেও পুরাতন মসজিদ কিয়ামত পর্যন্ত মসজিদ হিসেবে গণ্য হবে এবং মসজিদের সমস্ত বিধি-নিষেধ তার জন্য প্রযোজ্য হবে। (ফাতাওয়ায়ে তাতারিখানিয়া-৮/১৭৮, ক্বাওয়ইদুল ফিকাহ-৫৮, ফাতাওয়ায়ে মাহমুদিয়া-২/৪৬৬)

প্রসঙ্গ : পরচুলা

মুহাম্মদ আনোয়ার হোসাইন
বসুন্ধরা, ঢাকা।

জিজ্ঞাসা :

পরচুলা ব্যবহার করা নারী বা পুরুষের জন্য জায়েয কি না? এবং পরচুলা ব্যবহার করার সুরত কয়টি? শরীয়তের আলোকে জানিয়ে বাধিত করবেন।

সমাধান :

মানুষের চুল দ্বারা তৈরি যেকোনো প্রকারের পরচুলা নারী-পুরুষের জন্য ব্যবহার করা নাজায়েয, মাথা থেকে পৃথক করা সম্ভব হোক বা না হোক। অন্য কোনো প্রাণীর পশম বা অন্য কোনো বস্তু দ্বারা তৈরি কৃত্রিম চুল ব্যবহার করা প্রতারণার ইচ্ছা না থাকলে এবং ভিন্ন লিঙ্গের সাদৃশ্য অবলম্বন না হলে জায়েয, অন্যথায় না জায়েয।

পরচুলা ব্যবহারের দুটি পদ্ধতি প্রচলিত। ১. স্থায়ী যা মাথা থেকে পৃথক করা সম্ভব নয়। ২. অস্থায়ী যা মাথা থেকে পৃথক করা সম্ভব। জায়েয-নাজায়েযের ক্ষেত্রে উভয়টির বিধান একই। তবে মাসাহ ও ধৌত করার ক্ষেত্রে বিধান হচ্ছে, অস্থায়ী পরচুলা খুলতে হবে, অন্যথায় ওজু-গোসল শুদ্ধ হবে না। আর স্থায়ী পরচুলা থাকা অবস্থায় ওজু-গোসল সহীহ হয়ে যাবে। (বোখারী শরীফ-৫৯৩৪, উমদাতুল ক্বারী-১৮/১১৬, মিরক্বাত-৮/২৮০)

প্রসঙ্গ : দাফন

মাও. মাকবুল হোসাইন
সোনারগাঁ, নারায়ণগঞ্জ।

জিজ্ঞাসা :

মাইয়্যেতকে দাফন করার পর কবরস্থান ছেড়ে রাস্তায় এসে দরূদ শরীফ, সূরায়ে এখলাছ ইত্যাদি পড়ে সমস্ত মৃত ব্যক্তির জন্য হাত তুলে দু'আ করা যাবে কি না? কোরআন-সুন্নাহর আলোকে জানিয়ে বাধিত করবেন।

সমাধান :

যেহেতু নবী করীম (সা.) মাইয়্যেতকে দাফন করার পর সে স্থানে দাঁড়িয়ে দুই হাত মুবারক উঠিয়ে মাইয়্যেতের জন্য দু'আ করেছেন তাই মাইয়্যেতকে দাফন করার পর তার জন্য কিছু ইসালে সওয়াব করে একাকী বা সম্মিলিতভাবে হাত তুলে দু'আ করা শুধু জায়েয নয় বরং অনেকে মুস্তাহাব বলেছেন, তবে দু'আর সময় সকলের মুখ কিবলার দিকে থাকা উত্তম, যাতে করে মাইয়্যেত থেকে চাওয়ার সাদৃশ্য না হয়। (আবু দাউদ শরীফ-২/৪৫৯, মুসলিম শরীফ-১/৩১৩, ফাতহুল বারী-১১/১৭৩)

প্রসঙ্গ : মহিলাদের জামাআতে নামায

মুহাম্মদ মঈন উদ্দিন
লালমোহন, ভোলা।

জিজ্ঞাসা :

প্রশ্ন-১ : আমাদের এলাকার মসজিদে মহিলাদের জন্য নামায পড়ার শরয়ী পর্দার ব্যবস্থা রয়েছে, এমতাবস্থায় মহিলারা মসজিদে গিয়ে ইমামের পেছনে ইকতিদা করতে পারবে কি না?

প্রশ্ন-২ : ঈদের নামায অথবা জুমু'আর নামায মহিলারা পড়তে পারবে কি না? যদি পারে তাহলে মহিলাদের জন্য ভিন্নভাবে উভয় নামাযের জামা'আত করা বৈধতা আছে কি না?

প্রশ্ন-৩ : আমাদের দেশে প্রচলিত আছে যে কয়েকজন মহিলা সালাতুত তাসবিহের নামায আদায় করে এবং তাদের মধ্যে একজন ইমাম হয়ে বাকিরা সবাই তার পেছনে ইকতিদা করে, মহিলা ইমাম জোরে জোরে তাকবীর বলে আর তাসবিহ পড়ে। বাকি মহিলারাও তার সাথে সাথে তাসবিহ পড়ে। এখন জানার বিষয় হলো, এভাবে নামায আদায়ের বিধান শরীয়তে আছে কি না?

সমাধান-১ :

রাসূল (সা.) মহিলাদের ঘরে নামায পড়ার জন্য উদ্বুদ্ধ করেছেন এবং মহিলাদের মসজিদে নামায পড়ার চেয়ে ঘরের অন্দরমহলে পড়া উত্তম বলেছেন। তথাপি ইসলামী শরীয়তের প্রাথমিক যুগে মহিলাদের জন্য দ্বীন শিক্ষার উদ্দেশ্যে নবীজির মজলিসে যাওয়ার অনুমতি থাকলেও বর্তমান ফিতনা-ফ্যাসাদ ও নৈতিক অবক্ষয়তার যুগে মহিলাদের মসজিদে যাওয়ার অনুমতি নেই। (বোখারী শরীফ-১৪০, আদদুররুল মুখতার-১/৫৬৬)

সমাধান-২ :

ঈদের নামায ও জুমু'আর নামায মহিলাদের ওপর ওয়াজিব নয় বিধায় তাদের জন্য পৃথকভাবে জামা'আত করার প্রশ্নই আসে না। (আল-বাহরুর রায়েক্ব-২/২৬৪, কিফায়াতুল মুফতী-৩/৩৮৪)

সমাধান-৩ :

যেকোনো নামাযে মহিলাদের জামা'আত করা মাকরূহে তাহরিমী তথা নাজায়েয। উপরন্তু নফল নামায জামা'আতের সাথে পড়াও মাকরূহ, প্রশ্নোক্ত পদ্ধতিতে সালাতুত তাসবিহর জন্য মহিলাদের জামা'আত করার অবকাশ নেই। (নিজামুল ফাতাওয়া-৬/৩৯, আদদুররুল মুখতার-১/৫৬৫)

প্রসঙ্গ : রোজা

এ বি এস ফেরদৌস আলম
বোর্ড বাজার, গাজীপুর।

জিজ্ঞাসা :

আমি ২০০৮ সালের রমাজান মাসের শেষের দিকে জ্বরে আক্রান্ত হই, আমার ভাতিজি আমাকে রোজা অবস্থায় শরবত পান করায়। জ্বরের যে পরিমাণ ছিল তাতে শরবত পান করার বা রোজা ভাঙার কোনো প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু দ্বীনের বুঝ না থাকায় ভাতিজিকে শরবত পান করাতে বাধা প্রদান করিনি। পরের দিন ভোরবেলা জ্বর সেরে যায়। কিন্তু আমি আর পরবর্তী রোজাগুলো রাখিনি এভাবে সর্বোচ্চ ৫টি রোজা বাদ যেতে পারে। সঠিক হিসাব মনে নেই। দ্বীনের বুঝ না থাকার কারণে রোজাগুলো ছুটে গেছে।

অতএব, বিনীত নিবেদন এই যে ভেঙে যাওয়া রোজাগুলোর ক্ষেত্রে আমার করণীয় কী? জানিয়ে বাধিত করবেন।

সমাধান :

আপনার ছুটে যাওয়া পাঁচটি রোজার কাযা করতে হবে। যে রোজাটি রাখার পর বিনা উজরে শরবত পান করার মাধ্যমে ভেঙে দেওয়া হয়েছে, তার কাফ্ফারাও আদায় করতে হবে। রোজার কাফ্ফারা হলো ধারাবাহিক ৬০টি রোযা রাখা, তা সম্ভব না হলে ৬০ জন মিসকিনকে দুই বেলা খানা খাওয়ানো। (বাদায়ে উসসানায়ে-২/৬০৯, ফাতাওয়ায়ে হিন্দিয়া-১/২০৫, ফাতাওয়ায়ে সিরাজিয়া-১৬৩)

প্রসঙ্গ : শুক্রবারে মৃত্যুর ফজীলত

আবু বকর ছিদ্দিক তানভীর
মহেশখালী, কক্সবাজার।

জিজ্ঞাসা :

শুক্রবারের দিনে মৃত্যুবরণ করার ব্যাপারে হাদীসে কোনো ফজীলত বর্ণিত হয়েছে কি না? যদি হয়ে থাকে তাহলে উক্ত ফজীলত পাওয়ার জন্য শুক্রবারের দিনেই দাফন সম্পন্ন হওয়া জরুরি, নাকি শুক্রবার দিবাগত রাতে দাফন সম্পন্ন হলেও উক্ত ফজীলত পাওয়া যাবে?

সমাধান :

শুক্রবারে মৃত্যুবরণের ফজীলত সম্পর্কে যে হাদীস বর্ণিত হয়েছে তা হলো "যে ব্যক্তি শুক্রবার দিনে বা বৃহস্পতিবার দিবাগত রাতে মৃত্যুবরণ করবে আল্লাহ পাক রাব্বুল আলামীন তাকে কবরের আজাব থেকে মুক্তি দান করবেন এবং শহীদগণের তালিকায় তার নাম লিখে দেবেন। আর এ ফজীলত লাভের জন্য শুক্রবার দিনেই দাফনকার্য সম্পাদিত হওয়া জরুরি নয়। তাই শুক্রবার দিবাগত রাতে দাফন সম্পন্ন হলেও উক্ত ফজীলত পাওয়ার আশা করা যায়। (মুসান্নাফে আব্দুর রাজ্জাক-৫৫৯৫, আহসানুল ফাতাওয়া-৪/১৯৯)